ভূমিকা

পুঁথি - পরিচয়। (সংকলিত পুঁথির উৎস):-

ক্রঃ সংখ্যা	পুঁথি সংখ্যা	পত্র সংখ্যা	অনুলিপি কাল
১	xxx ত*-১(খণ্ডিত)	২-৩০, ৩৩-৯২, ৯৫, ৯৬, ৯৮-১১০, ১১৫-১৪২। (শেষ পাতাটি নাই, ২-১৪পৃ.- এক হাতের বাকী অংশ অন্য হাতের লেখা)	১১৯১ সাল (ওপরে একটি xxxx সাদা পাতার কোণে লেখা)
২	২ক (সম্পূর্ণ)	১-১০ ।	১২২৭ সাল, ২২শে মাঘ ।
৩	ব-সা-প-২৭৩৬(খণ্ডিত)	১-৫৩, ৫৬-৭৯ ।	১২০৫ সাল, (১৭১২ - পত্রের কোণে লেখা) ।
৪	৩ক (সম্পূর্ণ)	১-১৬ ।	১১৯২ সাল ১৬ই জৈষ্ঠ্য ।
৫	৪ক (সম্পূর্ণ)	১-৩৭ ।	১৩০৬ সাল ।
৬	৫প (খণ্ডিত)	১-২০, ২২, ২৩	১২৮২ সাল ।
৭	৭প (সম্পূর্ণ)	১-২২ ।	১২৫৪ সাল ।
৮	জোই*-৬ (সম্পূর্ণ)	১-২৭ ।	১৩০৩ সাল ।
৯	১০ক (সম্পূর্ণ)	১-২৭ ।	১২৮৭ সাল ।

ত* = তরঙ্গপুর। (ইহা পশ্চিম-দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ থানার অন্তর্বর্তী একটি গ্রাম, এইখানে একটি হাইস্কুল ও জুনিয়র বেসিক ট্রেণিং কলেজ আছে।)

জোই* = জোইডাঙ্গা। (ইহা হবিবপুর থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম, এই - গ্রামে গায়েন ফণী মণ্ডলের বাস। তাঁহার নিকট হইতে বিভিন্ন পালার মোট আটটি পুঁথি পাইয়াছি এবং তাহা নকল করিয়া আনিতে হইয়াছে।)

উপরিবর্ণিত ক্রমিক সংখ্যা ১ ও ৩ ছাড়া বাকী সব পুঁথিগুলিই মালদহ জেলার হবিবপুর ও বামনগোলা থানা অঞ্চল হইতে সংগৃহীত।

(৩ সংখ্যক পুঁথিটি কলিকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ভবনে রক্ষিত, ইহা ছাড়া এই কাব্যের আরও দুইখানা পুঁথি সাহিত্য-পরিষদে আছে। বিবরণ পর পৃষ্ঠায় পাঠান্তর অংশের পর দেওয়া হইল।)

পাঠান্তর অংশে ব্যবহৃত পুঁথি।

ক্র: সংখ্যা	পুঁথি সংখ্যা	পত্রসংখ্যা	অনুলিপি কাল।
১০	১ক (১ম পৃষ্ঠাটি নাই)	২-১৭ ।	১২৮৭ সাল।
১১	১খ (সম্পূর্ণ)	১-১৫ ।	নাই ।
১২	২খ (সম্পূর্ণ)	১-২৬ ।	নাই ।
১৩	ত-১ (পূর্বপত্রে বিবরণ দেওয়া আছে)।		
১৪	২গ (একটি সম্পূর্ণ পুরনো খাতা)	১-২৪ ।	১২৯২ সাল।
১৫	ক-৬১১৫ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত খণ্ডিত পুঁথি)		তা: ১১১১ সাল।
১৬	৩খ (সম্পূর্ণ)	১-২৬ ।	১২৮৭ সাল ৬ই বৈশাখ
১৭	৩গ (সম্পূর্ণ পুরনো খাতা)	১-২৪ ।	নাই ।
১৮	জোই-১ (খণ্ডিত)।	১-১৮ ।	নাই ।
১৯	৫ক (প্রথম পৃষ্ঠাটি নাই)	২-২৫ ।	১২৮২ সাল ৪ই পৌষ।
২০	৫খ (সম্পূর্ণ)	১-১৭ ।	নাই ।
২১	৫ঘ (খণ্ডিত)	১-১৩ ।	নাই ।
২২	জোই-২ (সম্পূর্ণ)	১-১৫ ।	১২৯৮ সাল।
২৩	৬ক (সম্পূর্ণ)	১-৩৬ ।	নাই ।
২৪	জোই-৩ (সম্পূর্ণ)	১-১৫ ।	নাই ।
২৫	জোই-৪ (সম্পূর্ণ)	১-৩৬ ।	নাই ।
২৬	৭ক (সম্পূর্ণ)	১-২০ ।	নাই ।
২৭	জোই-৫ (খণ্ডিত)	১-১৩,	নাই ।
২৮	৭খ (সম্পূর্ণ)	১-২০ ।	১৩১০ সাল।
২৯	জোই-৬ (সম্পূর্ণ)	১-২৬ ।	নাই ।
৩০	৮ক (সম্পূর্ণ)	১-১০ ।	১২৭৭ সাল।
৩১	৮খ (সম্পূর্ণ)	১-১৬ ।	১৩২০ সাল ।
৩২	জোই-৭ (সম্পূর্ণ)	১-৪০ ।	১৩১১ সাল।
৩৩	জোই-৮ (সম্পূর্ণ)	১-১৬ ।	১৩০০ সাল।
৩৪	১০ক (সম্পূর্ণ)	১-২৭ ।	১২৮৭ সাল ।

অতিরিক্ত পুঁথি।

৩৫	৫ঙ (খণ্ডিত)	১-৫,	নাই ।
৩৬	৫চ (খণ্ডিত)	৬, ৭,	নাই ।
৩৭	এস্-১৯ ডুপ্লিকেট (খণ্ডিত)	২-২৮,	নাই ।
৩৮	১গ (একটি খাতার অংশবিশেষ)		১২৯২ সাল।
৩৯	এস্-৬ ডুপ্লিকেট (সম্পূর্ণ)	১-৩৭ ।	১৩০৭ সাল ।

(উক্ত পুঁথিসকল ছাড়া আমাদের সন্ধানে তথা সংগ্রহে এক ও একাধিক পাতার খণ্ডিত পুঁথি বহু আছে। সেইগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয় এবং আমাদের সংকলন বা পাঠান্তরের কাজে সেইগুলির কোনরকম সাহায্য লওয়া হয় নাই উপরন্তু সংগৃহীত পুঁথি তালিকাভুক্ত করা হয় নাই বলিয়া সেইগুলির উল্লেখ হইতে বিরত থাকিলাম। সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত পুঁথিগুলির বিবরণ পরপৃষ্ঠে দেওয়া হইল।)

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থশালায় রক্ষিত -
মানিকদত্তের পুঁথিগুলির বিবরণ।

পুঁথি সংখ্যা	পত্রসংখ্যা	বিবরণ
২৭৩৫	১১-২৫ (খণ্ডিত)	প্রদাতা বনমালী ঘোষ (সাব্-ইন্সপেক্টর অব স্কুলস্, বালুরঘাট, জেঃ - পঃ দিনাজপুর।) পুঁথির বিষয় - শিবের বিবাহ। ১৯পৃষ্ঠায় - বুধবারের নিশাপালা আরম্ভ, - মানিকদত্তকে দেবীর পুঁথিপ্রদান ইত্যাদি। ২১ক পৃষ্ঠায় - মানিকদত্তের ভণিতা।
২৭৩৬	১-৫৩, ৫৬-৭১। (খণ্ডিত)	সৃষ্টিতত্ত্ব - অর্থাৎ কাব্যের প্রথম হইতেই আরম্ভ, মানিকদত্তকে পুঁথিদান, দুর্গার - ইন্দ্রকে ছলনা, পুত্রবরদান, অভিশাপ, কালকেতু উপাখ্যান সম্পূর্ণ। পুঁথিটি কীটদষ্ট ও জীর্ণ। ১৭।২ পত্রের কোণে - ১২০৫ সাল লেখা।
২৭৩৭	১৩-২০, ২২-২৮, ৩২-৪১, ৫১-৭৫, ৭৭-৮৭, ৮৯-১০০, ১০২-১৩০ (খণ্ডিত)	কলিঙ্গে পূজা প্রচারহেতু দেবীর মন্দির - নির্মাণের যুক্তি ও আদেশ, বনে পশু - সৃজন। দেবীর মানিকদত্তকে পুঁথিপ্রদান, ইন্দ্রকে পুত্রবর দান. - নীলাম্বরকে অভিশাপ ও মর্ত্তে প্রেরণ। কালকেতু উপাখ্যান প্রায় পুরো পুরিই সমাপ্ত। পরে বণিকখণ্ডের মধ্যে শ্রীমন্তের বাণিজ্য যাত্রা ও বাণিজ্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তণ। (৯২।২পত্রে কবিকঙ্কনের - ভণিতা আছে)।

মানিকদত্তের গানের গীতধারার পরিচিতি ।

শুধুমাত্র মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল পালাগানের গায়ক মালদহ জেলার মাত্র দুইটি থানার কিছু কিছু অঞ্চলে বর্ত্তমানে দেখা যায়। থানা দুইটি যথাক্রমে হবিবপুর ও বামনগোলা। এইসব অঞ্চলের গায়কদের নিকট হইতেই আমরা আমাদের সম্পাদিত বইএর অংশগুলি সংগ্রহ করিয়াছি। এইসব অঞ্চল ছাড়া পশ্চিমদিনাজপুরের তপনপুর থানার অধীন আনাউন নামক গ্রামে আমাদের সম্পাদিত বইএর যে বিশেষ বৃহৎ অংশটুকু পাইয়াছি তাহা ঐ গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা শ্রীরজনীকান্ত সরকারের নিকট হইতে। তাঁহার বয়স প্রায় ৬৫ বৎসর। তিনি হরিভক্ত, দিনরাত্রির অধিক সময় বৈষ্ণবসেবা ও পূজা লইয়া কাটান। বাড়ীতে মহাপ্রভুর পূজার জন্য একটি পৃথক ঘর আছে, সেইখানেই তার শয়ন, ভোজন, আরাধনা এবং বৈষ্ণবসঙ্গ চলে। তিনি নামসঙ্কীর্ত্তনের ন্যায় চণ্ডীমঙ্গলের পালাও গাহিতে পারেন। তবে পালাগানের কোন দল তাঁহার নাই বা তিনি অন্যত্র কোথাও গাহিতেও যাননা; তাই তাঁহাকে গায়েন আখ্যাও দেওয়া চলেনা। এই চণ্ডীমঙ্গল গানের যে সব গায়েনদের সন্ধান আমরা পাইয়াছি তাহা সবই মালদহ অঞ্চলের এবং উপরিউক্ত ঐ দুইটি থানার মধ্যেই তাহারা সীমায়িত। উপরিউক্ত থানা দুইটির মধ্যে একটিমাত্র পরিবার আমরা পাইয়াছি যাহাদেরকে ঠিক বংশপরম্পরায় না বলিলেও কতকটা ঐ ধরণেরই গায়ক আখ্যা দেওয়া যায় এবং সব চাইতে লক্ষনীয় ব্যাপার এই যে তাহারা শুধুমাত্র মানিকদত্ত রচিত চণ্ডীমঙ্গলেরই পালাগান করেন অন্য কোন গান বা অন্য কোন চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতার গান করেননা। এইভাবে তিন পুরুষের কথা এ অবধি সংগ্রহে সক্ষম হইয়াছি। এখন যিনি বর্ত্তমান গায়ক অর্থাৎ শুধুমাত্র চণ্ডীমঙ্গল গানই করেন এবং একমাত্র মানিকদত্তেরই গান করেন তাহার নাম ফনী মণ্ডল, বয়স ৪০, হবিবপুর থানার মাইল দুয়েক উত্তরে জোইডাঙ্গা নামক গ্রামে তাহার বাড়ী। তাহার দাদু অর্থাৎ মাতামহ তাহার গানের গুরু, নাম মাতাল মণ্ডল বর্ত্তমান বয়স ৬৮, বাসস্থান খোঁচাকান্দর, হবিবপুর থানার অন্তর্গত। হবিবপুর থানা হইতে 'হাইওয়ে' ধরিয়া মালদহ শহরের দিকে প্রায় মাইল দুই আসিলে তাজপুর গ্রাম পাওয়া যায়; সেখানে নামিয়া মাইলখানেক উত্তর দিকে হাটিলেই খুঁটাকাটা গ্রাম। সেই গ্রামেই মাতাল মণ্ডলের বাস। মাতাল মণ্ডল ও ফনী মণ্ডল উভয়েরই গান শোনার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে। এইস্থলে বলিয়া রাখা ভাল যে মাতাল মণ্ডল এখন আর নিজে গান করেননা। কারণ প্রথমতঃ বয়সজনিত, দ্বিতীয়তঃ গান গাওয়ার মত উপযুক্ত শিষ্য থাকা হেতু। কিন্তু আমাদের সবিশেষ অনুরোধে তিনি এক আসর গান করেন এবং এই বয়সেও তাহার গানের উৎসাহ ও বর্ননাভঙ্গি দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই। তাহার কণ্ঠের গান আমরা টেপ করিয়া লইতেও সক্ষম হইয়াছি বলিয়া আমরা একইসাথে আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ।

তাহার গান শোনার সুযোগ ও সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল একটি বিবাহ বাড়ীতে এবং ঐ বিবাহ বাড়ীতে গান হইবে জানিয়াই আমরা সেই-স্থানে গিয়াছিলাম। বিবাহবাসরটি মাতাল মণ্ডলের গ্রামেই এবং তাহার আত্মীয় বাড়ী বলিয়াই হয়তো মাতাল মণ্ডলের গান শোনা আমাদের ভাগ্যে জুটিয়াছিল। এছাড়া তাহার শিষ্য ফনী মণ্ডলের নিকট হইতে আমরা বার কয়েক গান শুনিয়াছি তন্মধ্যে সম্পূর্ণ পালাগান শুনিয়াছি দুবার। খণ্ড খণ্ডভাবে আরও বারপাঁচেক তাহার গান শোনার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে, তন্মধ্যে বারচারেকই শুনিয়াছি বিভিন্ন বিবাহ বাড়ীতে। পূর্ণ পালাগান [illegible] শোনার ব্যবস্থা হইয়াছিল আমার পূর্বতন সহপাঠী ও এ বিষয়ে একান্ত সাহায্যকারী বন্ধু শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ ভকতের গৃহে তাহারই সহায়তায়। দীর্ঘ আটদিন বন্ধুবর রাজেনের গৃহে বামনগোলা থানার অন্তর্গত পাকুয়াহাট নামক গ্রামে থাকিয়া আমাদের প্রয়োজনেই গান শুনিয়াছি এবং মাঝে মাঝে আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্য এবং আমাদের কাজের প্রয়োজনের খাতিরে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছি ও তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়াছি।

আর একবার কালকেতু খণ্ডটি অর্থাৎ চারদিনের পালাগান শুনিয়াছি হবিবপুরের অঞ্চলপ্রধান মাননীয় অজিত সরকার মহাশয়ের কৃপায়। তার কিছু-কাল পরেই ধনপতি উপাখ্যানটি শুনিয়াছি আগ্রহী গায়ন স্বয়ং ফনী মণ্ডলেরই বাড়ীতে। তিনবারে সম্পূর্ণ পালাখানা শোনার জন্য আমাদের মোট সময় ব্যয় করিতে হইয়াছে প্রায় মাসাধিক কাল। বার বার গান শোনার মধ্যে আমাদের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল পালাবিভাগগুলি লক্ষ্য করা এবং প্রতিদিনের গান আরম্ভ করা ও শেষ করার পদ্ধতিগুলি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করা। এক্ষেত্রে পালাবিভাগের ক্ষেত্রে কিছু বলার আছে কিন্তু গান আরম্ভ বা শেষের ব্যাপারে তেমন কিছু লক্ষণীয় নাই। ঐসব অঞ্চলে প্রচলিত অন্যান্য গানের মতই যথা মনসামঙ্গল, জীমূতবাহন, পালাকীর্তন প্রভৃতির ন্যায় ঘটস্থাপন, তারপর দেব-দেবী-বন্দনা এবং পরে মূল অংশে প্রবেশ ও শেষদিন পুনরায় নির্দিষ্ট দেব বা দেবীর উদ্দেশ্যে স্তুতিপাঠ ও মঙ্গলামঙ্গল বর্ননায় গানের সমাপ্তি। পালা-বিভাগের ক্ষেত্রে তাহারা গানের সুবিধার জন্যই হউক বা অষ্টমঙ্গলার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই হউক গানের পূর্ণ অংশটিকে ষোলপালায় গায়নেরা ভাগ করিয়াছেন। আমাদের সঙ্কলিত পুঁথির শেষাংশে সপ্তদিবা অষ্টরাত্রি গানের কথা আছে। মালদহ অঞ্চলের গায়নেরা এই নিয়মটিকে অতিমাত্রায় মানিয়া চলেন বলিয়া সেই অনুযায়ী পালাগুলির ভাগ করিয়াছেন। স্বয়ং মানিকদত্ত কোন্ পালা কোন্ কোন্ সময়ে গাহিতেন তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ এখন পাওয়া দুস্কর তবে পালাগুলির ভাগ দেখিয়া মনে হয় ইহা স্বয়ং মানিকদত্ত কৃত কারণ তাহা না হইয়া যদি ইহা গায়নদের অভিরুচি বা নিজ নিজ সুবিধামত হইত তাহা হইলে সব গায়নেরই পালাবিভাগ বা বিশেষ বিশেষ দিনে রাতে বিশেষ বিশেষ পালা গাওয়া একভাবে মিলিত না।

(পালাবিভাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই প্রবন্ধশেষে দেওয়া হইল ।)

উপরিউক্ত বৃদ্ধ গায়েনের গুরুদেবের নাম সদাগর মণ্ডল। তিনি আজ হইতে প্রায় বছর তিরিশেক আগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। এইস্থলে একটি ঘটনার উল্লেখ একান্ত প্রয়োজন যেহেতু উক্ত সদাগর মণ্ডল ছিলেন আবার মাতাল মণ্ডলের মাতামহ। ঘটনাটি বেশ কৌতুকাবহ যে প্রত্যেকেই প্রায় তাহাদের দৌহিত্রকে এই গানের দীক্ষা দিয়া গিয়াছিলেন। অবশ্য সদাগর মণ্ডলের গুরুদেবের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক এই ধরণের ছিল বলিয়া জানা যায়না তবে আত্মীয়তা ছিল সে কথা পরবর্তী বংশীয়েরা বলেন কিন্তু আত্মীয়তার সঠিক সম্পর্ক কি তাহা বলিতে পারেননা।

সদাগর মণ্ডলকে কেহ কেহ সদা মণ্ডল বা সদা গায়েনও বলেন। তাহার বাড়ী ছিল খোচাকান্দর গ্রামে, গ্রামটি হবিবপুর থানার অন্তর্গত। খোচাকান্দরে সদাগর মণ্ডলের বাড়ী হইলেও তাহার দূর সম্পর্কের আত্মীয় তথা গায়েন ও গানের গুরু বারিন্দা নিবাসী সাধু মণ্ডলের নিকটেই তিনি থাকিতেন এবং শেষজীবন অবধি তিনি গুরুগৃহেই থাকিয়া গিয়াছিলেন। তাহার বংশধর বর্তমানে বারিন্দার দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী তাইতোর গ্রামে বসবাস করে। এখানে উল্লেখ্য যে বারিন্দা নামক গ্রামটি বামনগোলা থানার অন্তর্গত এবং থানা অফিস হইতে মাইল তিনেক পূর্বে গ্রামটি বর্তমান। অনেকে বলেন সাধু মণ্ডলের গুরুদেব ছিলেন ফুদিরাম মণ্ডল। তাহার বাড়ী ছিল তুরুক মনাইল নামক একটি গ্রামে। গ্রামটি বারিন্দার মাইলখানেক দক্ষিণে। ফুদিরাম মণ্ডল সম্পর্কে এর চাইতে বেশী আর কিছু জানা যায়না। তবে এইটুকু শোনা যায় যে ফুদিরাম মণ্ডলের দুই শিষ্য ছিল এবং দুইজনেই দুইটি গানের দল করে; অবশেষে অপর দলটি বিনষ্ট হয় এবং সাধু মণ্ডলের দলই আধিপত্য বজায় রাখে ও পরবর্তী শিষ্য বহাল করে। ফুদিরাম মণ্ডলের অপর শিষ্যটির নাম ছিল কুঞ্জলাল মণ্ডল। বর্তমানে তাহার বংশধরেরা চাষআবাদ লইয়াই ব্যস্ত, গানের খবর কেহ রাখেনা বা রাখিতে আগ্রহীও নয়।

গান গাওয়ানোর অভাবে তথা উৎসাহ ও আগ্রহের অভাবে আমাদের মনে হয় বর্তমান গায়ক ফনী মণ্ডলের পর শুধু মাত্র চণ্ডী মঙ্গল গানের গায়ক হিসাবে আমরা আর কাহাকেও পাইবনা। কারণ ফনী মণ্ডলের বক্তব্য অনুযায়ী যাহা বুঝিতে পারি এবং ঐসব অঞ্চলে দীর্ঘকাল পরিভ্রমণ ও অনুসন্ধান করিয়া যাহা জানিতে পারি তাহাতে একথা সত্য বলিয়া মর্মে মর্মে উপলব্ধ হয় যে এতদঞ্চলের মনুষ্যবর্গেরা নিয়তই খাদ্যাভাবে ব্যস্ত। তাহাদের প্রাণরক্ষার তাগিদে তাহারা অনবরত চিন্তাক্লিষ্ট, কি করিয়া তাহাদের সংসার চলিবে সেই চিন্তায় তাহারা অবিরত নিমগ্ন। সারাদিন ক্ষেতমজুর খাটার পর উপযুক্ত খাদ্যাভাবে বুভুক্ষায়, শীর্ণদেহ পল্লীবাসীর আর গানের উৎসাহ থাকেনা। ঐসব অঞ্চলের প্রায় প্রত্যেকেই গরীব, তদুপরি জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ উপরন্তু জমিতে ফসলের পরিমাণ ক্রমশ: কমের দিকে, এমনকি কোন কোন বছর ফসল হয়না বলিলেই চলে। কারণ বর্ষাই একমাত্র ঐসব অঞ্চলের ভরসা, বছরে ফসল বলিতে মাত্র একটি, হৈমন্তিক ধান্য।

ঐ ফসলটি কোন রকমে মারা পড়িলেই চাষীরা হাহুতাশ করে, জর্জরিত হয় ঋণের দায়ে। অতএব এই অবস্থায় তাহাদের নিকট হইতে গানের অস্তিত্ব বজায় রাখার আশা সত্যিই বৃথা। সারা এলাকা জুড়িয়া যে দুই-একজন বর্ধিষ্ণু ব্যক্তি আছেন তাহারাও দেশের অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই হউক বা জমিতে উৎপাদনহ্রাসের কথা চিন্তা করিয়াই হউক সামান্য একটু আনন্দ বা অনুষ্ঠান করিয়া সামান্য কিছু অপব্যয় করিতেও রাজী নন। তাই আজ হইতে পঞ্চাশ বছর আগে গানের দলের যে ধরণের চাহিদা বা সমাদর ছিল তাহার একাংশও আজ নাই। পয়সা দিয়া গান করানোতো দূরের কথা দীর্ঘপালাগান অর্থাৎ আটদিন ধরিয়া গান করাইতে হইলে কমপক্ষে দলের ১০।১২ জন লোককে আটদিন ধরিয়া খাওয়াইতে হইবে ভাবিয়াই কেহ আর গানের কথা ভাবেনওনা। উপরন্তু আগে লোকেদের যে ধর্মভয় ছিল তাহা ইদানীং কালে একেবারে উঠিয়া গিয়াছে বলিয়া চণ্ডীদেবীও আর পূজা পাইতেছেননা বা তাঁহার গানও আর প্রচারিত হইতেছেনা। তিনি যে ইহার জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া কোন শাস্তিবিধান করিতেছেন তাহাও বুঝিতেছিনা।

ঐসব অঞ্চলের লোকেদের তথা রাজবংশী সমাজের একটি বিশেষ প্রচলিত নিয়ম এই যে বিবাহের সময় তাহাদের মঙ্গলচণ্ডী অর্থাৎ অষ্টমঙ্গলা গাহিতেই হইবে, তাহা না হইলে বিবাহ অমঙ্গলকর হইবে। এই প্রচলিত মতটিও আর সর্বত্র বর্তমান নহে। যাহারা মোটামুটি সচল তাহারা পাড়াপ্রতিবেশীদের ধরিয়া গ্রামের নাম সঙ্কীর্তনের খোল করতাল প্রভৃতি লইয়া দায়সারা মত একআধ পালা মঙ্গলচণ্ডীর গীত গাহিয়া অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন পাছে অমঙ্গল হইতে পারে এই আশঙ্কায়। কেহ কেহ তো আমলই দেননা, অবশ্য অমঙ্গলের কোন চিহ্ন পরবর্তীতে দেখেননা বলিয়াই হয়তো দিন দিন লোকেদের সাহস বাড়িতেছে সেইসঙ্গে গান বাজনায় অপচয়ের উৎসাহ কমিতেছে। যাহাদের পাড়াতে গায়ন বা চণ্ডীমঙ্গলগানের দলের লোকেরা থাকে তাহাদের পাড়াতে ২।১ পালা গান ভালভাবে হয় অবশ্য যদি সেইগ্রামে একটু বড়দরের চাষীবাড়ীতে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই বছর সেই চাষীর ভাল ফসল অর্থাৎ ধান উৎপাদন হইয়া থাকে। তবুও গায়নদের সেই চাষী অর্থাৎ গ্রামের মোড়লকে গান করানোর জন্য পীড়াপীড়ি করিতে হয়। ঐসব অঞ্চলের লোকেরা গ্রামের সবার চাইতে একটু উন্নত মানের অর্থাৎ যাহার ঘরে অধিক শস্য ওঠে তাহাকে মোড়ল বলে বা মোড়ল পদবীতে সম্মানিত করে। যদি মোড়লের কৃপা হয় এবং তিনি গায়ন তথা গায়নদের দলের লোকেদের প্রস্তাবে খুশী হন তাহা হইলে তাহাদের বিবাহ বাড়ীতে বার দুই অধিক খাওয়ার জোটে এবং আর বেশী কিছু নয়। মোড়ল অত্যধিক খুশী হইলে মূল গায়নকে একটি নূতন কাপড় দান করেন বলা বাহুল্য দান সামগ্রীটি যথাসম্ভব কম মূল্যের এবং তাহা অধিক সময়েই মূল গায়নের অনুরোধে দেন। এই ধরণের গান দেখা শোনার সৌভাগ্য আমাদের বারকয়েক হইয়াছিল এবং শুধু গায়নই নয় আমাদেরও আগে হইতেই বিবাহের খোঁজখবর লইয়া মোড়লকে গানের অনুষ্ঠান করানোর জন্য মাত্রাতিরিক্ত অনুরোধও করিতে হইয়াছিল।

সর্বক্ষেত্রে কৃতকার্য হইয়াছি এমন অহঙ্কার করিনা তবে অকৃতকার্যতার সংখ্যা কম এইটুকুই বলিতে পারি। এইসব জন্য আমাদের যে কতবার কত জলবৃষ্টি কাদায় মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে তাহার হিসাব দাখিল করিলে অন্যের নিকট তাহা অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হইবে তাই বিরত থাকিলাম। তবে একটা কথা বলা চলে যে গান শোনার চাইতে পুঁথি সংগ্রহেই আমাদের ~~বিশেষ~~ অধিক সময় ~~তার চেষ্টা~~ ব্যয়িত হইয়াছে। অতএব এ গান যে আর অধিকদিন চলিবেনা বা পুঁথিপত্র সংরক্ষণও কেহ করিবেনা অর্থাৎ ইহার অপমৃত্যু অনতিবিলম্বে যে ঘটিতে চলিয়াছে বা অপঘাত মৃত্যু প্রায় হইয়াই পড়িয়াছে ফনী মণ্ডল গায়ন মহাশয়ের একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য এবং ইহার প্রতিকার আমাদের জানা নাই যদি না ইহাকে বাঁচানোর ইম চেষ্টা সরকারের তরফ হইতে হয়।

এইসব জাত গায়ন ছাড়া আরও কিছু গায়নদের সাথে আমাদের পরিচয় ঘটিয়াছে এবং তাহাদের সম্পর্কে আমাদের কাছে বিস্তারিত তথ্যও আছে যাহা এস্থলে দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করিনা। এই ধরণের গায়নেরা শুধুমাত্র মঙ্গলচণ্ডী অর্থাৎ মানিকদত্তরচিত মঙ্গলচণ্ডীর গানই করেননা। তাহারা করেন মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল(মুকুন্দরাম), পালাকীর্তন, আলকাপ আবার সুযোগ পাইলে মানিকদত্তের গানও করেন। আমরা ইহাদের সাথে আলাপ করিয়া ও কিছু কিছু গান শুনিয়াও এইটুকু উপলব্ধি করিয়াছি যে গান ইহাদের নেশা নয় পেশা এবং ইহারা প্রায় প্রত্যেকেই একটি গান আরম্ভ করিয়া তাহার ওপর সুবিধামত সব গানগুলিকেই আরোপ করিতে থাকেন অর্থাৎ যতগুলি তাহাদের জানা আছে। যেমন বামনগোলা থানার পুরুলাগ্রামের যামিনীকান্ত মণ্ডল, তুরুক মানোহল গ্রামের তপেন মণ্ডল, হবিবপুর থানার ভাবুক গ্রামের পশী-মণ্ডল, সেকন্দরা গ্রামের দেবী সিং প্রভৃতি। এখানে উল্লেখ্য যে উপরিউক্ত চারজন গায়ক বা এই শ্রেনীর গায়কদের কাহারও কাছে মানিকদত্তের পুঁথি নাই। সকলেই কবিকঙ্কনকে মানিকদত্ত বলিয়া প্রয়োজন বিশেষে চালাইয়া দেন। এমনকি কবিকঙ্কনের বইও যে তাহাদের সবার আছে তাহাও নহে। কিছু কিছু জানা অংশ লইয়া তাহাতে কিছু আলকাপ, কিছু কীর্তন প্রভৃতি ঢুকাইয়া বিবাহ আসরে কাজ সারামত ঘ্ন্টাখানেক কাটাইয়া দেয়। ইহার অতিরিক্ত ইহাদের কাছে আশা করাও অন্যায়, সেকথা তাহারা নিজেরাই স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয় তাঁহার বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাসে* মালদহের সিঙ্গাবাদ অঞ্চলে এই ধরণের গান সম্পর্কিত যে অনুষ্ঠানের কথা ভবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর প্রবন্ধ অনুসরনে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অনুসন্ধান করিয়া তথা সিঙ্গাবাদের জমিদার বাড়ীর কনিষ্ঠ পুত্র আমার বন্ধুবর শ্রীআনন্দচন্দ্র তালুকদারের গৃহে দুদিন অবস্থান করিয়া যাহা জানিয়াছি তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীসেন ও চৌধুরী মহাশয়ের বক্তব্য সত্য। তবে সে জাতীয় অনুষ্ঠান দীর্ঘ ২০।২৫ বছর হইতে আর আদৌ অনুষ্ঠিত হইতেছেনা। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে যাহা উত্তর মিলিয়াছে তাহা পূর্বানুরূপ অর্থাৎ জনজীবনের বাঁচার তাগিদ ও জনসমস্যা, খাদ্যসমস্যা ইত্যাদি যে সমস্যাগুলি মানুষকে ভুলাইয়াছে আনন্দ, বিসর্জন দিয়াছে তাহাদের বহুকালের প্রথা, রীতি, ভয়, ভীতি প্রভৃতি।

---

* প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ (চতুর্থ সংস্করণ) পৃ.-৫০৭ ।

পালা সংখ্যা - পালা বিভাগ - বিষয়বস্তু ।

১) - মঙ্গলবার রাত্রির পালা - সৃষ্টিখণ্ড, দুর্গার সহিত শিবের বিবাহ, পুত্রদ্বয়ের জন্ম ।

২) - বুধবার দিবসের পালা - ইন্দ্রের নিকট হইতে দুর্গার পক্ষ দাসী প্রাপ্তি, মর্তে পূজাপ্রচারের চেষ্টা, দেবীর সুরথরাজকে পূজার নির্দেশ, মানিকদত্তকে পুঁথিদান ও স্বীয়পূজাপ্রচারের কাজে নিয়োগ ।

৩) - বুধবারের নিশা পালা - দেবীর পশু সৃজন, শিবের বন ও জলসৃজন, দুর্গার ইন্দ্রকে ছলনা ও পুত্রবরদান, ইন্দ্রপুত্রের জন্ম ও বিবাহ ।

৪) - বৃহস্পতিবার দিবসের পালা - নীলাম্বরের শাপ, মর্তে ব্যাধ কালকেতুরূপে জন্ম, ফুল্লরার সহিত বিবাহ, বীরবিক্রমে পশুশিকার, পশুগণের দেবীর নিকট প্রার্থনা ।

৫) - বৃহস্পতিবার রাত্রির পালা - ছলনাশেষে দেবী কর্তৃক কালকেতুকে ধনদান, অবশেষে পূজাপ্রচারের ও নগরপত্তনের নির্দেশ দান ।

৬) - শুক্রবার দিবসের পালা - দেবীর সহায়তায় কালকেতুর গুজরাট নগরপত্তন, সুরথরাজের সৈন্যবর্গের সহিত যুদ্ধ, দেবীর চক্রান্তে কেতুর বন্দীদশা ও পরে মুক্তির জন্য দেবীর নিকট প্রার্থনা ।

৭) - শুক্রবার রাত্রের পালা -*(১) - দেবীর দয়ায় কেতুর মুক্তি, পরে পুত্রলাভের জন্য কেতুর সাধনা, দেবীর নির্দেশে সাধনাত্যাগে ফুল্লরা সহ কেতুর স্বর্গে গমন ।

৮) - শুক্রবার রাত্রের পালা -*(২) - দেবীর চক্রান্তে (স্বীয় পূজাপ্রচারের প্রয়োজনহেতু) বিভিন্নভাবে অভিশাপের মাধ্যমে ধনপতি, লহনা, খুল্লনার মর্তে জন্ম । প্রথমে ধনপতির সহিত লহনা ও পরে খুল্লনার বিবাহ ।

৯) - শনিবার দিবসের পালা - শুকশারী প্রসঙ্গ, পক্ষীদ্বয়ের জন্য বিক্রমকেশর কর্তৃক স্বর্ণপিঞ্জর আনয়নে গৌড়গমনে ধনপতির প্রতি নির্দেশ। ধনপতির গৌড়যাত্রা ও গৌড়ে অবস্থান । অপরদিকে লহনা কর্তৃক জালপত্রযোগে খুল্লনাকে দিয়া বনে ছাগল চরানো - তাহার রূপযৌবন বিনাশহেতু । দেবী কর্তৃক ছাগল চরানো হইতে খুল্লনাকে রক্ষা ।

পালা সংখ্যা - পালা বিভাগ - বিষয়বস্তু ।

১০) - শনিবার রাত্রের পালা - ধনপতি খুল্লনা মিলনে দেবীর প্রচেষ্টা। স্বর্ণ-পিঞ্জরসহ গৌড় হইতে ধনপতির প্রত্যাবর্তন, ধনপতি ও খুল্লনার মিলন। দেবী কর্তৃক পুনরায় স্বীয় উদ্দেশ্য - সাধনে শাপ প্রয়োগে মালাধর ও তাহার দুইস্ত্রীকে - মর্ত্তে প্রেরণ এবং যথাক্রমে খুল্লনা, নীলারানী ও বিক্রম কেশরের স্ত্রীর গর্ভে তাহাদের জীব সঞ্চার। ধনপতির পিতৃ পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে জ্ঞাতিগণকে নিমন্ত্রণ। জ্ঞাতিবর্গদ্বারা - খুল্লনার চরিত্রে সংশয় ও পরীক্ষাদানের প্রস্তাব এবং পরে খুল্লনার সম্মতি।

১১) - রবিবার দিবসের পালা - খুল্লনার পরীক্ষা, জয়লাভ, জ্ঞাতিভোজন।

১২) - রবিবার রাত্রের পালা - চন্দনহেতু রাজনির্দেশে ধনপতির দক্ষিণপাটন যাত্রা, খুল্লনার পূজার ঘটে পদাঘাতজনিত ধনপতির পথে দেবী-কর্তৃক বিড়ম্বন, কমলেকামিনী দর্শন ও সেইপ্রসঙ্গে সিংহলরাজ-কর্তৃক ধনপতির বন্দীদশা ও কারাগারে বন্ধন ও ধনপতির প্রার্থনা।

১৩) - সোমবার দিবসের পালা - ধনপতির প্রতি দেবীর কিঞ্চিৎ দয়া। খুল্লনার - সাধভক্ষণ - শ্রীমন্তের জন্ম, পাঠাভ্যাস, পণ্ডিতের বচনের ফলে শ্রীমন্তের পিতৃঅন্বেষণে দক্ষিণ পাটনে যাওয়ার উদ্যো খুল্লনার অনুরোধে দেবীর সহায়তায় সব ব্যবস্থা, সপ্ত-ডিঙ্গা সহ শ্রীমন্তের যাত্রা।

১৪) - সোমবার রাত্রির পালা - মগরায় শ্রীমন্তের বিড়ম্বনা, কালিদহে xxxxxxx-xxxxx কমলেকামিনী দর্শন, সিংহলরাজ শালবান সকাশে শ্রীমন্ত, দেবীর চাতুরিফলে শ্রীমন্তের বন্ধন ও দক্ষিণমশানে শিরঃচ্ছেদ ব্যবস্থা। শ্রীমন্তের তর্পন।

১৫) - মঙ্গলবার দিবসের পালা - দেবীর নিকট শ্রীমন্তের প্রাণরক্ষাহেতু প্রার্থনা, দেবীর আগমন এবং পরে দেবীর সহিত কোটাল ও রাজসেনার যুদ্ধ।

১৬) - মঙ্গলবার রাত্রির পালা - দেবীর সহিত দ্বিতীয়বার যুদ্ধ, পরে শালবানের ক্ষমাভিক্ষা, কমলেকামিনী দর্শনলাভ, শালবানকন্যার সহিত শ্রীমন্তের বিবাহ, পিতাকে বন্দীদশা হইতে উদ্ধা সকলে মিলিয়া উজানী অভিমুখে যাত্রা, পথে দেবীর পূজা গৃহে ফিরিয়া পূজা ও বিক্রমকেশরের কন্যার সহিত xশ্রীxxxx শ্রীমন্তের বিবাহ, দেবী কর্তৃকx খুল্লনা, শ্রীমন্ত, জয়া, সুশীল এই চারজনকে লইয়া স্বর্গে গমন, ইন্দ্রের নিকট তাহাদিগকে - প্রত্যর্পন, সকলকে পাইয়া ইন্দ্রের আনন্দ ও মর্ত্তে পূজা প্রচারের - উদ্দেশ্য সফলশেষে দেবীর কৈলাসে গমন। সর্বশেষে ব্রতকথা।

** শুক্রবার রাত্রিতে কবি তথা গায়ন মানিকদত্ত কর্তৃক পর পর একইসঙ্গে দুইটি পালা করা বা গাওয়ার ব্যবস্থা করারx উদ্দেশ্য হয়তো কাব্যমধ্যে মোট-

ষোল পালাকে বজায় রাখা কারণ অষ্টমঙ্গলা গানে মোট ষোলটি পালা থাকাই হয়তো তাঁহার নিকট বাঞ্ছনীয় ছিল। অথবা একটি উপাখ্যান শেষ হওয়ার সাথে সাথেই আরেকটি উপাখ্যানের আরম্ভ করিয়া গানের ধারাবাহিকতা অখণ্ড রাখা তথা দেবীকে সন্তুষ্ট রাখাও হয়তো তাঁহার অন্যতম কারণও হইতে পারে। তাহা না হইলে একদিকে যেমন ষোলটি পালার পরিবর্তে পনেরটি পালা করিতে হয় তেমনই অন্যদিকে এক আসরে কালকেতু উপাখ্যান শেষ করিয়া আবার পরবর্তী বেলায় নূতনভাবে অন্য আসরের সূচনা তথা বণিকখণ্ডের ভূমিকা [illegible] স্থাপন করিতে হয়। যাহাই হউক কবির এই পরিকল্পনা মন্দ নহে এবং পরবর্তী তথা বর্তমান গায়নেরা এই নিয়মটিকেই এখনও পুরোপুরি মানিয়া চলিতেছে।

(উপরিউক্ত প্রবন্ধে আলোচিত ব্যক্তিদের ছাড়া আর যাহাদের নিকট হইতে একাধিক পুঁথির সাহায্য বা সন্ধান পাইয়াছি তাহাদের নাম ও ঠিকানা নিম্নে উল্লিখিত হইল. বলা বাহুল্য পুঁথি বলিতে সবই মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের।

১) কুঞ্জলাল মণ্ডল, পিতা মৃত রূপলাল মণ্ডল, সাং - হরিপুর
পো: - পাকুয়াহাট জেলা- মালদহ (বামনগোলা থানা

২) রূপচরণ মণ্ডল, পিতা মৃত ঢেলুরাম মণ্ডল, সাং - বারিন্দা
পো: - দিঘনবা, জেলা- মালদহ (বামনগোলা থানা)

৩) গোকুল মণ্ডল, পিতা মৃত বটেশ্বর মণ্ডল। (ঠিকানা ২নং এর অনুরূপ)।

কাহিনী :- ১ম অংশ।

শূন্যে হস্তপদস্কন্ধবিহীন এক মাংসপিণ্ডরূপে ধর্ম্মের জন্ম হইল এবং তিনি জন্মিয়াই গোলোকের ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। ধ্যানাবস্থায়ই ক্রমে তাহার সেই মাংসপিণ্ডের মধ্য হইতে চক্ষু কর্ণনাসিকা প্রভৃতি প্রকাশ পাইল। তারপর ধর্ম্ম জলের উপর বসিয়া যোগনিদ্রায় নিমগ্ন হইলেন এবং যুগ যুগ কাটিয়া যাইতে লাগিল। কতযুগ যে অতিবাহিত হইল তাহার ধারণাই তিনি করিতে পারেন নাই, একসময়ে যোগনিদ্রা হইতে তাহার ব্যুত্থান হইলে নিকটস্থ উলূককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে চৌদ্দযুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। তখন ধর্ম্ম সৃষ্টিকার্যে মনোনিবেশ করিলেন। তাহার প্রথম সৃষ্টি একটি কমল, তারপর পাতালে যাইয়া মৃত্তিকা ও মৃত্তিকা হইতে পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া তাহাকে পরপর বরাহদন্তে, গজপৃষ্ঠে ও কূর্ম্মপৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া তাহাদের ভারবহনে ব্যর্থতা দেখিয়া নিজের পৈতা ছিঁড়িয়া সপ্তমস্তকবিশিষ্ট এক নাগের সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাকে অমরতার বর দিয়া সজীব পৃথিবী ধারণের নির্দেশ দিলেন।

ধর্ম্মের 'হাম্বি-'তে নারীরূপী আদ্যার সৃষ্টি হইল এবং তাহার রূপযৌবনে স্বয়ং ধর্ম্মই আকৃষ্ট হইলেন। ধর্ম্ম চারিটি দিক্ সৃষ্টি করিলে - আদ্যা চারিটিদিকে পরপর পলায়নপর হইয়া ধর্ম্মকে তাহার পিতৃত্বের কথা বারবার স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন। এই চলমান অবস্থায় ধর্ম্মের বিন্দুপাত ঘটিয়া গেলে তিনি উহা তিনস্থানে ভাগ করিয়া রাখিলেন। এই তিনস্থান হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উৎপত্তি হইল এবং তাঁহারা তিনজনেই তিলকুশ লইয়া নদীর ঘাটে তপস্যায় বসিলেন।

ধর্ম্ম শবরূপ ধারণ করিয়া ভাসিতে ভাসিতে প্রথমে ব্রহ্মার নিকট গেলে ব্রহ্মা এবং পরে বিষ্ণুর নিকট গেলে বিষ্ণুও তাহাকে চিনিতে না পারিয়া তপস্যাস্থান ত্যাগ করিয়া গেলেন। শব শিবের নিকট পৌছিলে শিব ধ্যানযোগে তাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া চিনিলেন। ধর্ম্ম নিরঞ্জন শিবকে আদেশ দিলেন নিরামিষের ঘাটে তাহাকে দাহ করিতে। শিব শবদাহ করিলেন। অতঃপর ধর্ম্মনিরঞ্জন পরপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে বলেন আদ্যাকে বিবাহ করিতে। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু অস্বীকার করিলে শিব শর্তাধীনে স্বীকার করেন। সেই শর্তানুযায়ী আদ্যা পরপর ছয়জন্ম গ্রহণ করার পর ৭ম জন্মে হিমালয়ের কন্যা হইয়া গৌরী নামে অভিহিত হইলেন। বয়স একটু বাড়িলে হিমালয় আদেশ দিলেন গৌরী শিবপূজা করিতে থাকুক। ইতিমধ্যে দেবতাদের চক্রান্তে উদ্বুদ্ধ মদন শিবের উপর কামবাণ নিক্ষেপ করিতে যাইয়া ভস্মীভূত হন। মদনপত্নী রতি পতিশোকে মুহ্যমান হইলে সরস্বতী তাহাকে আশ্বস্ত করেন। তারপর দুর্গা শিবকেই পতিরূপে পাওয়ার জন্য কঠোর সাধনায় নিমগ্ন হইলে একদিন শিব দেখা দিয়া দুর্গার প্রস্তাবে সম্মত হন।

শিবের কথায় নারদ হিমালয়ের রাজসভায় যাইয়া গৌরীর সহিত শিবের বিবাহ প্রস্তাব দেন। হিমালয় সম্মত হন এবং নারদ যাইয়া সে কথা শিবকে জানাইলে শিব সকল দেবতাকে আমন্ত্রণ করেন। দেবতারা আবার গঙ্গার হাতে-ভিন্ন ভোজনে আপত্তি জানাইলে - শিব নিজেই শান্তনু মুনির নিকট যাইয়া গঙ্গাকে রন্ধনের জন্য চাহিলে শান্তনু এই শর্তে রাজী হইলেন যে - শিব রাত্রি থাকিতেই গঙ্গাকে আনিয়া দিয়া যাইবে। শিব সম্মত হইয়া গঙ্গা সহ কৈলাসে আসিলে গঙ্গা রন্ধন করিলেন এবং দেবতারা ভোজনে বসিলে নারদ কোন্দল বাধাইয়া দিলেন। ফলে রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিল, গঙ্গা কাঁদিতে লাগিলেন! শিব তখন তাড়াতাড়ি গঙ্গাকে লইয়া শান্তনু মুনির কাছে গেলে তিনি প্রতিজ্ঞাভঙ্গের জন্য আর গঙ্গাকে গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন না। শিব তখন গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করিলেন।

শিব নারদ ও ভীমকে দিয়া বিবাহের অধিবাস দ্রব্য হিমালয়ের বাড়ীতে পাঠাইলেন। পথে নারদ ও ভীম ভাল দ্রব্য সব খাইয়া ফেলিয়া বালি দিয়া ভাণ্ডগুলি পূরণ করিয়া লইয়া হিমালয়ের গৃহে দিলে মেনকা তাহা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। নারদ শিবের ঘাড়ে সব দোষ চাপাইলে নারীরা নারদকেই উপযুক্ত শাস্তি দিবে বলিয়া শাসাইল। ইহাতে নারদ ক্রুদ্ধ হইয়া নারীদের আক্রমণ করিলে মুনিরা তাহাকে নিরস্ত করিলেন। নারদ ভীমসহ কৈলাসে ফিরিলেন।

হিমালয়ের গৃহে গৌরীর অধিবাস আরম্ভ হইল। জলসাধা ও অন্যান্য স্ত্রী-আচার চলিতে লাগিল। কৈলাসে শিব নন্দীকে দিয়া বৃষ সাজাইয়া ভূতপ্রেতসহ বিবাহে যাত্রা করিয়া ক্রমে হিমালয়-গৃহে উপস্থিত হইলে তাহার বরণ আরম্ভ হইল। নারদের ইঙ্গিত পাইয়া শিব উলঙ্গ হইয়া পড়িলে মেনকা মাথা নীচু করিলেন এবং পুরবাসিনীরা সাপের ছোবলের ভয়ে পলাইতে লাগিলেন। গৌরীর জন্য একটি পাগল বর নির্বাচন করা হইয়াছে বলিয়া মেনকা ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং হিমালয়কে দোষী বলিয়া গালাগাল দিতে আরম্ভ করিলে হিমালয় তাহাকে প্রবোধ দিয়া শিবের গুণকীর্তন করিতে লাগিলেন। কিন্তু মেনকা প্রবোধ মানা দূরে থাকুক, তিনি বলিলেন কন্যাকে লইয়া জলে ঝাঁপ দিবেন। শিব ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মমন্ত্র জপিয়া নিজের শ্রী বদলাইয়া কামিনীমোহন রূপ ধারণ করিলে মেনকা আশ্বস্ত হইলেন এবং বিবাহের উদ্যোগ করিতে ব্যাপৃত হইলেন। ব্রাহ্মণ নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করার পর পিতা হিমালয় নামগোত্র উল্লেখপূর্বক কন্যা দান করিলেন। দুর্গা শিবকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া তাহার গলায় মালা পরাইয়া দিলেন।

একদিন দুর্গা তাহার গাত্রমল হইতে একটি পুতুল নির্মাণ করিয়া তাহাতে জীবদান করিয়া নাম দিলেন গণেশ। তাহাকে দেখার জন্য আহূত সর্বদেবতার মধ্যে শনিও আসিলেন এবং শনির দৃষ্টিতে গণেশের মুণ্ড উড়িয়া গেল। উত্তর শিয়রে শায়িতের মুণ্ড কাটিয়া আনিতে শিব নির্দেশ দিলেন।

ইন্দ্রের ঐরাবতকে সেই অবস্থায় পাওয়া গেলে তাহার মুণ্ড কাটিয়া আনা হইল এবং শিব মন্ত্র জপিয়া তাহা গণেশের স্কন্ধে জুড়িয়া দিলেন।
আকৃতি দেখিয়া ক্রন্দনপরা দুর্গাকে শিব এই বলিয়া আশ্বস্ত করিলেন যে সর্ব্বদেবতার পূজার পূর্ব্বেই গণেশের সম্মানে পূজা সকলকেই দিতে হইবে। শিবের বরে ইন্দ্রের ঐরাবতেরও নূতন মুণ্ড হইল। গণেশ তাহার বাহন মূষিকের উপর চড়িয়া আনন্দে বেড়াইতে লাগিলেন। ইহার পর দুর্গার গর্ভে কার্ত্তিকের জন্ম হইল, কার্ত্তিক হইলেন ছয়মুণ্ড. তিনিও বাহন ময়ূরে চড়িয়া আনন্দে বেড়াইতে লাগিলেন। পুত্রদ্বয়ের রক্ষনাবেক্ষনের জন্য দাসীর প্রয়োজন অনুভব করিয়া দুর্গা নারদসহ ইন্দ্রপুরে যাইয়া তাহার নিকট হইতে পঞ্চদাসী লইয়া কৈলাসে ফিরিলেন। শিবের প্রলুব্ধ দৃষ্টি দাসীদের উপর পড়িতেই দুর্গা তাহাকে নিবারিত করিয়া পুত্রদের রক্ষনাবেক্ষনে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিলেন।

একদিন পদ্মা দুর্গাকে জ্যোতিষের পুঁথি শুনাইতে আসিলে দুর্গা নিজের পূজা মর্ত্তে না হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন ধুম্রাসুরের ভয়ে সকলেই সেখানে ত্রস্ত। ইহাকে বধ করিলে তিনি মর্ত্তবাসীর পূজা পাইতে পারেন। ইহার ভয়ে অন্য দেবতারা ও মুনিরাও মর্ত্তে যাইতে পারেননা। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্গা শতবাণ লইয়া ধুম্রের বিরুদ্ধে মর্ত্তে গেলে ধুম্রও সৈন্যসামন্ত লইয়া যুদ্ধে অবতীর্ন হইয়া দুর্গাকেই অচেতন করিয়া ফেলিল। কিন্তু শিবের আজ্ঞায় চেতন হইয়া দুর্গা চক্রবাণে ধুম্রের মাথা কাটিয়া বুকে শেল দিলেন। দেবতারা আনন্দিত হইয়া দুর্গার পূজা করিলেন।

দেবলোক পূজা করিলেও মর্ত্তবাসী তখনও পূজা করেনা। তখন দেবী পদ্মাকে পুনঃকারণ জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার প্রস্তাবে কলিঙ্গরাজ সুরথকে প্রজাসহ পূজা করার নির্দেশ দেন এবং তাহার রাজ্যের মধ্যে একটি দেউল নির্মাণের জন্য বিশ্বকর্ম্মাকে নির্দ্দেশ দিলেন। তাহার সাহায্যের জন্য হনুমানকে সঙ্গে দিলেন। সুরথের নিকট স্বপ্নে দুর্গা নিজের পরিচয় দিয়া বলেন, তিনিই শিবের ঘরনী, ব্রহ্মার ব্রহ্মানী ও বিষ্ণুর ঘরের কমলা। সুরথ ও তাহার প্রজারা দুর্গার পূজা করিলে রাজ্যপাট বৃদ্ধি পাইবে। প্রথম-পূজা হইবে তাহারই রাজ্যে বিশ্বকর্ম্মা রচিত মন্দিরে। পরদিন প্রাতে রাজা পাত্রমিত্র ও প্রজাবর্গকে স্বপ্নবৃত্তান্ত কহিয়া মন্দিরের খোঁজ করিতে চর পাঠাইলেন। চর ঘুরিয়া আসিয়া সুন্দর ও বিরাট মন্দিরের খোঁজ দিল। রাজা ছাগমেষ মহিষ প্রভৃতি নানা উপচারে প্রজাবর্গসহ মন্দিরে যাইয়া শুদ্ধবেশে মন্দিরে পূজা করিলেন।

মর্ত্তে পূজা প্রচারে মনোনিবেশ করিয়া স্বয়ং দুর্গা উপায় নির্দ্ধারনের জন্য পদ্মাকে বলিলেন। পদ্মা বলিলেন গানের মাধ্যমে মর্ত্তে পূজা প্রচার করা দরকার এবং ফুলফুল্যানগরের অধিবাসী কানাখোঁড়া মানিকদত্তকে গান করার জন্য স্বপ্ন দেখান দরকার, তাছাড়া গানের জন্য গীতপুঁথি দরকার, তাহা ইন্দ্রের কাছে আছে।

তখন দুর্গা পঞ্চনায়িকাসহ ইন্দ্রপুরে যাইয়া বলিলেন মুনিরচিত চণ্ডী ভুবনবিখ্যাত হইয়াছে বটে কিন্তু মঙ্গলগীতের পুঁথি আমি কোথায় পাই ? ইন্দ্র বলিলেন মঙ্গলগীতের পুঁথি তাহার নিকট আছে বটে কিন্তু সম্পূর্ন পুঁথি দিলে ইন্দ্রপুরী তো অন্ধকার হইয়া যাইবে । সুতরাং তিনি দুর্গাকে অর্দ্ধেক পুঁথি দিলেন। কিন্তু দুর্গার নিকট পরপর প্রার্থী বাসুকী ও গন্ধর্বগণকে ক্রমশ: অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক দিতে দিতে এক অষ্টমাংশ পুঁথি লইয়া দুর্গা মানিকদত্তের শিয়রে আসিয়া পদাঘাত করিতেই তাহার কানা খোঁড়া ভাব কাটিয়া যায় এবং তাহার আকৃতিও সুন্দর হয় । তখন দেবী তাহাকে স্বপ্নে নির্দ্দেশ দেন সেই একের আট অংশ পুঁথি দিয়া সে যেন মঙ্গলগানের মাধ্যমে তাহার পূজা প্রচার করে । চেতন পাইয়া মানিকদত্ত বাস্তবিকই শিয়রে একটি পুঁথি পান । এবং একমাসের মধ্যেও পুঁথির পাঠ শেষ করিতে না পারিয়া বিরক্ত হইয়া পুঁথি বাঁধিয়া রাখেন । দেবী জানিতে পারিয়া পুনরায় মানিকদত্তকে স্বপ্নে বলেন যে কোনরূপ সংশয় না করিয়া সে যেন পুঁথি রচনা করিয়া লয় । প্রভাতে উঠিয়া দত্ত পুঁথি খুলিয়া দেখিল তাহাতে তিনলক্ষ নাচারী আছে । ইহাকেই সংক্ষেপ করিয়া মানিকদত্ত ৩৩২ নাচারী করিলেন এবং তাহার সহিত নিজের সুবিধামত পদ দিশা সংযোজন করিয়া লইলেন। অত:পর মানিকদত্ত একটি ছোট গানের দল গঠন করিলেন- এই দলে রঘু ও রাঘব নামে দুই ব্যক্তি ছিল 'পালী' অর্থাৎ দোহার এবং তম্বুরা বাদক ২।১জন ছিল । এই দলটি গান করিবার জন্য কলিঙ্গ-নগরে উপস্থিত হইল ।

কলিঙ্গনগরে গিয়া মঙ্গলবারে চণ্ডীর ঘটস্থাপন করিয়া সেই দল ভবানীর মঙ্গলগান আরম্ভ করিল । কাহারও নিকট ধণকড়ি লইলনা । গানে শ্রোতৃবর্গ মোহিত হইয়া গেল এবং নিজেদের কাজকর্ম পর্যন্ত ভুলিয়া গেল । রাজ দরবার জনশূন্য হইতে লাগিল । রাজা এই অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন মানিকদত্তের গানে সকলে মত্ত হইয়া সবকিছু ভুলিয়া গিয়াছে রাজা তখন কোতালকে পাঠাইয়া মানিকদত্তকে দরবারে আনাইলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া মিথ্যা গীতে লোকেদের কাজকর্ম নষ্ট করার অপরাধে দত্তকে অভিযুক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন দত্ত কোন্ দেবতার গান করে এবং সে দেবতাই বা কি আকৃতির? মানিকদত্ত বলেন যে সিংহের পৃষ্ঠে পা দিয়া পঞ্চনায়িকাসহ মঙ্গলচণ্ডিকা তাহার নিকট আবির্ভূত হইয়াছিলেন । রাজা বিশ্বাস না করিয়া তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া গালি দিয়া এবং পরদিন তাহার শাস্তির ব্যবস্থা হইবে বলিয়া তাহাকে ধুলিয়া কাঠরে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন । এই অবস্থায় দত্তের কাতর প্রার্থনায় দেবী স্বপ্নে তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন তিনি রাজাকে স্বপ্ন দেখাইয়া তাহার মুক্তির ব্যবস্থা করিবেন পরে রাজার শিয়রে যাইয়া স্বপ্নে আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন 'আমি চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী দেবী দুর্গা' বলিয়াই তিনি বিকটবদনে রাজার বুকে চাপিয়া বসিলেন, রানীকেও নিপীড়ন করিলেন এবং মানিকদত্ত যে তাহার ভক্ত তাহা জানাইয়া অন্তর্হিত হইলেন ।

73957
28 MAR 1981

প্রভাতে রাজা পাত্রমিত্রের নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিয়া মানিকদত্তকে মুক্ত করিয়া তাহাকে নানা উপহার দিয়া আপ্যায়ন করিয়া অষ্টমঙ্গলা গান গাহিতে বলিলেন। এইভাবে কলিঙ্গে দেবীর পূজা প্রচারিত হইল। দেবীকে স্বমূর্তিতে দেখার আগ্রহে রাজা সুরথ নিরাহারে তপস্যারত হইলে দেবী ত্রিনয়নী দশভুজারূপে দেখা দিলেন এবং রাজার প্রশ্নের উত্তরে দেবী তাহার তিনচক্ষুর স্বরূপ ও দশহাতের ক্রিয়াকারিতার কথা তাহাকে একে একে জানাইলেন ; রাজারও মনোবাসনা পূর্ন হইল।

এবারে পদ্মার উপদেশে দেবী পশু সৃজন করিলেন। কিন্তু তাহাদের বাসযোগ্য বন নাই; পেয় জলও নাই, নারদসহ ভ্রমনরত শিব একদিন ইহা লক্ষ্য করিয়া বীজুবন সৃষ্টিতে মন দিলেন এবং বলিরাজার নিকট হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়া তাহা বপন করিলে ইন্দ্রের বৃষ্টিপাত ও পবনের বায়ুসঞ্চালনে বনের ও জলের সৃষ্টি হইল। শিব বনকে অমর বর দিলেন এবং পশুরা আনন্দিত হইল। প্রসঙ্গত শিব ভাঙের সৃষ্টি করিলেন যে ভাঙ খাইলে বিভিন্ন শ্রেনীর মানুষের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া বিভিন্নরূপ হয়। পদ্মাসহ মর্ত্তে ভ্রমনরত দুর্গা আচম্বিতে বন দেখিয়া শিবের প্রতি রুষ্ট হইলেন এবং পদ্মাকে তাহার ব্রতপ্রচারের উপায় নির্ধারন করিতে বলিলেন। পদ্মা তপস্যারত ইন্দ্রের তপস্যা ভাঙাইয়া তাহাকে পুত্রবর দিতে বলিলেন + তাহার পর ব্রতপ্রচারের ব্যবস্থা হইবে। দুর্গা কৈলাসে ফিরিলেন। শিব গেলেন ভিক্ষায়। ভিক্ষায় নানা জিনিষ পাইয়া ফিরিলে পুত্রদুইটি আনন্দিত হইল, গৌরী রন্ধন করিলে সকলে আহারে তৃপ্ত হইল। পরদিনও শিব ভিক্ষায় গেলেন কিন্তু এবারে গেলেন কলিঙ্গে। রাজাসহ সকল প্রজাকে তাহার পূজা না করিয়া ভবানীর পূজায় রত দেখিয়া অভিশাপ দিলেন- অবিলম্বে কলিঙ্গ শহর ভাঙ্গিয়া যাইবে। শিব ফিরিয়া আসিলেন।

এদিকে দুর্গা যোগিনীর বেশ ধারণ করিয়া ইন্দ্রের তপস্যাস্থানে যাইয়া তিনটি কচ্ছপ ধরিয়া তাহার উপর পাকপাত্র চড়াইয়া অগ্নিসংযোগ করিতেই কচ্ছপগুলি সরিয়া যাইতে থাকিল। দেবী একটিকে ধরিয়া আনিতে আনিতে অপরটি পালায়। ইহা দেখিয়া ইন্দ্র যোগিনীকে ভর্ৎসনা করিলে উভয়ের কথা কাটাকাটিতে ইন্দ্রের তপোভঙ্গ হইয়া গেল। যোগিনী বলিলেন তোমার তপস্যার অবসর নাই - শচী তোমার সহিত মিলনের জন্য মনে মনে পীড়িত হইতেছেন। আমি দুর্গা তোমার দুঃখে কাতর হইয়া আসিয়াছি, আমাকে ভজনা কর শিবকে ভজিয়া লাভ নাই - দৃষ্টান্ত রাবণ। ইন্দ্র বলিলেন তোমার স্বমূর্তি ধারণ কর তবে বুঝিব তুমি দুর্গা। তখন দুর্গা ত্রিনয়নী-দশভুজা মূর্তি ধারণ করেন। ইন্দ্র ভীত হইয়া প্রনাম করিয়া তাহাকে এইমূর্তি সম্বরন করিতে বলিলেন। দেবী তখন ইন্দ্রকে পুত্রবর দান করিলে ইন্দ্র স্বভুবনে প্রস্থান করিলেন। ইহার দশমাসদশদিন পর শচী এক পুত্র প্রসব করিলেন। আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম্মশেষে ছেলের নাম রাখা হইল নীলাম্বর। বিশেষ বিশে বয়সে তাহার অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ প্রভৃতি হইয়া গেল, বার বৎসর বয়সে তাহার বিবাহের উদ্যোগ হইতে লাগিল। ইন্দ্রের অনুরোধে নারদ-

চন্দ্রমুনির কন্যার সহিত নীলাম্বরের বিবাহ ঠিক করিলেন। চন্দ্রমুনির বাড়ী ছিল বিরাটনগরে, তাহার কন্যার নাম ছায়াবতী। নারদ ঢেকীবাহনে ব্রহ্মমন্ত্র জপিয়া যাত্রা করিলেন। বিরাটনগরে যাইয়া বিবাহ ঠিক করিয়া নারদ ফিরিলেন। নীলাম্বর বিবাহের জন্য চৌদলে চড়িয়া বাদ্যভাণ্ডসহ যাত্রা করিল। বিবাহে নারদ নিমন্ত্রন পান নাই, তিনি দৈবাৎ ইন্দ্র ভবনে যাইয়া কদলীবৃক্ষ রোপনের হেতু শচীকে জিজ্ঞাসা করিয়া সব জানিলেন। শচী তাহার আপ্যায়নের পানগুয়া আনিতে গেলে নারদ মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন বিরাটনগরে যাইয়া কোন্দল বাধাইবেন। সেইমত তথায় যাইয়া মন্দার গাছে ঢেঁকি বাঁধিয়া কোন্দল বাধাইয়া দিলেন। বিবাহ বাসরে সমবেত সকলের মধ্যে তখন প্রথমে মুখে মুখে তারপর হাতে হাতে কীলাকীলি হইতে হইতে সবকিছু লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। রাইহরাও অস্থির হইয়া উঠিল। অবশেষে ইন্দ্র গলবস্ত্র হইয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করায় নারদ কোন্দল সামলাইয়া লইলেন। ব্রহ্মাদি দেবতারা বেদধ্বনি করিতে লাগিলেন, মুনিঋষিরা বিবাহমণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। ছায়াবতী হেটমুণ্ড বিবাহ সভায় আসিয়া স্বামীকে সপ্তপ্রদক্ষিণ করিয়া তাহার গলায় মালা দিল। চন্দ্রমুনি ভাণ্ডার উজার করিয়া যৌতুক দিলেন। ইন্দ্র পুত্রবধূ সহ গৃহে ফিরিলে শচী পুত্রবধূ বরণ করিয়া লইলেন।

কাহিনী-২য় অংশ।

শিবের কথায় ইন্দ্র নীলাম্বরকে শিব পূজা করিতে বলিলেন। নীলাম্বর স্বীকৃত হইয়া ফুল তুলিতে যাইয়া পথে নারদের সাক্ষাৎ পাইলে নারদের প্রশ্নের উত্তরে নীলাম্বর জানাইল যে সে শিব পূজা করিরে বলিয়া ফুল তুলিতে যাইতেছে। নারদ গিয়া দুর্গাকে এইকথা জানাইলে দুর্গা ক্রুদ্ধ হইয়া শিবকে বলিলেন, আমার বরে নীলাম্বরের জন্ম সে আমাকে পূজা না করিয়া শিবকে পূজা করিবে কেন? এই লইয়া বাদানুবাদের ফলে দুর্গা পিতৃগৃহে চলিলেন। শিব পিছন লইলে দুর্গা চক্রহস্তে তাহাকে আক্রমণ করেন। চক্রের তাপে শিব ঘামিতে থাকেন এবং সেই ঘাম মাটিতে পড়িতেই সেখান হইতে ধর্ম্মকেতু ও নিশানকেতু নামে দুই ব্যাধের জন্ম হইল। শিবের আদেশে ব্যাধেরা দুর্গাকে আক্রমণ করিতেই দুর্গা বলিলেন আমি তোমাদের মা, সুতরাং আমাকে আক্রমণ করিওনা। এই বলিয়াই তিনি নিজের বস্ত্র চিপিয়া দুই ব্যাধিনীর জন্ম দিলেন, নাম হইল নিদয়া ও কমলা। দুর্গা ইহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত দুই ব্যাধের স্ত্রী করিয়া দিলেন এবং ব্যাধগণকে বলিলেন তোমরা পশুশিকার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ কর এবং নীলাম্বরকে ছলনা কর। শিব দুর্গাকে ঘরে ফিরিবার অনুরোধ করিলে দুর্গা বলিলেন নীলাম্বরকে শাপ দিয়া ব্যাধের ঘরে জন্মানোর সর্ত্তে তিনি ফিরিতে রাজী। শিব অনন্যোপায় হইয়া সেই সর্ত্তেই রাজী হইলেন বটে তবে বিনাদোষে নহে। দুর্গা দোষ ঘটানোর ব্যবস্থা করিতে রাজী হইয়া বলিলেন তাহাকে মর্ত্তে জন্মগ্রহণের শাপ দিতে হইবে। শিব সম্মত হইলে উভয়ে গৃহে ফিরিলেন।

একদিন নীলাম্বর যখন পুষ্পচয়নে বনে গেলেন দুর্গা তখন মায়া হরিনের রূপ লইয়া দুইব্যাধের শরাঘাত এড়াইয়া তাহাদের সম্মুখে ছুটিতে লাগিলেন। নীলাম্বর ভাবিলেন এইভাবে অনাহারী অবস্থায় ফুলতোলা অপেক্ষা এমন সুন্দর ব্যাধজীবনই পরম সুখের। বিরক্তির সহিত তিনি ডালপালা সহ ফুল তুলিয়া গৃহে ফিরিলে ইন্দ্র সেই ফুল লইয়া পুজায় বসিলেন। দুর্গা সেই ফুলের মধ্যে চাটিপোকার রূপে লুকাইয়া রহিলেন। ইন্দ্রের পুষ্পগুলি হইতে শিব মস্তকে দংশন অনুভব করিয়া ইন্দ্রের উপর ক্রুদ্ধ হইলে ইন্দ্র বলিলেন ফুলতো নীলাম্বর আনিয়াছে। নীলাম্বরকে জিজ্ঞাসা করিলে সে সত্য কথা বলিল যে, ফুল তোলার সময় ব্যাধ ও হরিনী দেখিয়া সে ব্যাধজীবনের জন্য লালায়িত হইয়াছিল। শিবপূজার কথা সে ক্ষণতরে ভুলিয়াই গিয়াছিল। শিবও তৎক্ষণাৎ তাহাকে মর্ত্তে ব্যাধরূপে জন্মাইবার শাপ দিলেন।

নীলাম্বর গলায় কাটারি দিয়া [illegible] প্রাণত্যাগ করিলে ছায়াবতী সহমৃতা হইল। দেবী তাহাদের আত্মা লইয়া মর্ত্তে গিয়া ধর্মকেতুর স্ত্রী - নিদয়ার গর্ভে নীলাম্বরের ও স্বর্নকেতুর স্ত্রী দয়াবতী (কমলার) গর্ভে ছায়াবতীর জীব সঞ্চার করিলেন। কালক্রমে নিদয়ার প্রসবকালে পাচতির সাহায্যে তাহার গর্ভমোচন করান হইল। পুত্রসন্তানের জাত কর্ম্মের পর তাহার নাম রাখা হইল কালকেতু। একটু বড় হইয়া উঠিয়া কালকেতু পিতার সহিত শিকারে গিয়া আশ্চর্য্য কুশলতা দেখাইতে লাগিল। ক্রমে পুত্র আরও বড় হইয়া বীর হইয়া উঠিলে পিতা ধর্মকেতু তাহার বিবাহের বিষয় চিন্তা করিয়া শ্রীকলার হাটে গিয়া স্বর্নকেতুর কন্যা ফুল্লরার সহিত বিবাহ ঠিক করিল। যথাকালে অধিবাসের পর কালকেতু ফুল্লরার বিবাহ হইল x এবং কালকেতু বহু যৌতুক পাইল। বিবাহান্তে দুই বৈবাহিক বনে শিকার করিতে যাইয়া উভয়েই পরস্পরকে পশু ভাবিয়া তীর নিক্ষেপ করিলে উভয়েরই মৃত্যু হইল এবং নিদয়া ও কমলা (দয়াবতী) সহমৃতা হইল। একদিনে চারজনকে হারাইয়া কালকেতু কিছুদিন বিমর্ষ হইয়া রহিল। গৃহে খাদ্য না থাকায় কালকেতু ধনুর্বাণ লইয়া শিকারে যাইয়া ব্যাঘ্র-সহ নানা পশু শিকার করিল। শেষে এক হরিনীকে বধ করিতে উদ্যত হইলে হরিনী নানাকথা তাহাকে বলিল। হরিনীর কথা শুনিয়া কালকেতু দুঃখ প্রকাশ করিয়া ক্ষমা চাহিল। হরিনী কেতুকে শান্ত করিয়া চলিয়া গেলে কেতু শিকার লইয়া গৃহে ফিরিল এবং ফুল্লরাকে পসার লইয়া বাজারে যাইতে বলিল। ফুল্লরা নিজ দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিয়া দুঃখের সহিত পসরা লইয়া বাড়ীর বাহির হইল। পথে দুর্গা ব্রাহ্মনীর মূর্ত্তি ধরিয়া তাহাকে ছলনা করিলেন। পুনরায় কালকেতু তাহার মিতাকে লইয়া শিকারে গেল। পশুরা তাহার ভয়ে ভীত হইয়া দেবীর শরণাপন্ন হইলে দেবী গোধিকামূর্ত্তি ধরিয়া কালকেতুর সম্মুখে আসিলেন। ক্রমে কালকেতু ধনিয়াডাঙ্গা জঙ্গলে আসিলে দেবী কেতুর চক্ষে ধুলা ছিটাইয়া দিলেন - ফলে সে আর পশু দেখিতে পাইলনা। শূন্যহস্তে বাড়ী যাওয়া নিরর্থক ভাবিয়া সে বৃক্ষতলে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। দেবী তখন পুনরায় মৃগরূপ ধারণ করিয়া কেতুর সম্মুখে দেখা দিলে কেতু দেখিতে পাইল এবং অর্জুন - বাণ ছাড়িল, বাণটি দেবীর বামহাতে বিঁধিয়া রহিল।

কেতু হরিনের অন্বেষণে অগ্রসর হইলে দেবী গোধিকারূপ ধারণ করিয়া তাহার সম্মুখে পড়িলেন। কেতু গোধিকা ধরিয়া ধনুকের হুলে বাঁধিয়া বাড়ী আসিয়া ফুল্লরাকে উহা রন্ধন করিতে বলিল এবং নিজে স্নানে গেল। ফুল্লরা গোধিকাকে ঝাঁকা চাপা দিয়া পড়শীর বাড়ী গেলে দেবী বুঝিলেন তাহাকে কাটিয়া ফেলিবে, তখনই তিনি ব্রহ্মমন্ত্র জপিয়া পাশমুক্ত হইলেন এবং কৈলাসে গিয়া পদ্মাকে এই বিপদ জানাইলে তিনি দেবীর এইভাবে যাইয়া ধনদানের ব্যাপারকে মূঢ়তা বলিয়া দেবীকে লক্ষের কাচুলী পরিয়া উৎকৃষ্ট বেশে যাইতে বলিলেন। দেবী তখন চিত্রগোবিন্দ নামক কারিগরকে ডাকিয়া চারিখান কাচুলী বানাইলেন - দেবকাচুলী, পুষ্পকাচুলী, মৎস্য-কাচুলী ও পক্ষীকাচুলী।

কাচুলীতে অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিতা হইয়া দেবী পদ্মাসহ কালকেতুর গৃহে যাইতে পথে নারদের সহিত দেখা হইলে দেবী শিবের নিকট তাহা বলিতে বারণ করিয়া দিলেন। কালকেতুর বাড়ীতে পচা মাংসের গন্ধ তথাপি দেবী সেখানে প্রবেশ করিলেন। ফুল্লরা সখীর নিকট হইতে চাল ধার করিয়া বাড়ী ফিরিয়া সুন্দরী রমনী দেখিতে পাইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। দেবী নিজের পরিচয় দিয়া তথায় বাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ফুল্লরার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে হতবুদ্ধি হইয়া মাসীর নিকট গিয়া সবকথা বলিলে মাসী বুদ্ধি দিল তাড়াইয়া দেওয়ার এবং কালকেতুর আসার পূর্বেই। কারণ সে সতিনী হইতে পারে। ফুল্লরা ফিরিয়া গালমন্দ পাড়িয়া ভবানীকে তাড়াইবার চেষ্টা করিয়া বিফল হইল এবং শেষে বলিল না গেলে সে স্ত্রীহত্যা দিবে। সে দেবীকে পাপপুণ্যের কথাও শুনাইল, ভয় দেখাইল কেতু সব কাড়িয়া লইবে। শুনিয়া দেবী হাসিলেন মাত্র এবং বলিলেন তাহার পতি ভিখারী শিশু দুইটির জন্য তাহার এখানে থাকার ইচ্ছা। তাছাড়া তিনিতো পথেই বসিয়া ছিলেন কালকেতুই তাহাকে বাড়ীতে আনিয়াছে। ফুল্লরা পুনরায় তাহাকে গালাগালি দিলে তিনি বলিলেন তিনিই কেতুকে লইয়া শুইয়া থাকিবেন এবং ফুল্লরা তাহার সেবা করিবে। ফুল্লরা তখন তাহার বারমাসের দুঃখের কথা বলিল। দেবী উত্তর করিলেন ইহা ফুল্লরার চাতুরী মাত্র। শুনিয়া ফুল্লরা ক্রুদ্ধ হইল কিন্তু দেবী স্থির রহিলেন। দেবী তখন বলিলেন যে তিনি কেতুকে ধন দিতে আসিয়াছেন। এই কথায় ফুল্লরা মাসীর সহিত যুক্তি করিয়া কেতুকে ডাকিতে গেল। কেতুকে পরনারী আনার জন্য অভিযোগ করিয়া তাহাকে রাবণের কথা স্মরণ করাইয়া দিলে কেতু ক্রুদ্ধ হয় এবং গৃহে ফিরিয়া অভয়ার চরণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই পরে মৃগচর্ম দিয়া প্রণত: হইয়া দেবীকে বন্দনা করে। কেতু পরিচয় চাহিলে দেবী তাহার সহিত বাসের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। কেতু তখন ধনুর্বাণ তুলিয়া দেবীকে মারার চেষ্টা করে কিন্তু দেবীর হুংকারে বাণ ধনুতেই লগ্ন থাকিয়া যায়। দেবী হাসিয়া বলেন তিনি তাহাকে ধন দিতেই আসিয়াছেন। দেবী অঙ্গুরী খুলিয়া কেতুর হাতে দিলে কেতু নাড়িয়াচাড়িয়া দেখিতেই অর্থে ফুল্লরা অল্পমূল্যের অঙ্গুরী লইতে কেতুকে নিষেধ করে।

দেবী দশভুজা তখন তাহাদিগকে নিকটে আহ্বান করিয়া বিকটাদশনা শবারূঢ়া কালিকা মূর্তি দেখাইলে তাহারা মূর্ছা যায় ও তাহাদের মুখ হইতে রক্ত পড়িতে থাকে। দেবী তখন উভয়কেই কোলে তুলিয়া নেন, তাহারা তখন নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকে। দেবীর পাদস্পর্শে কেতু চৈতন্য পাইলে দেবী নিজ মহিমা ব্যাখ্যা করিয়া পুনরায় ধন দিতে চাহিলেন। এবারেও ফুল্লরা আপত্তি জানায়। দেবী বলিলেন ডালিম গাছের গোড়ায় যে সাত ঘাট ধন আছে তাহা কেতুই পাইবে। কেতু দেবীর হাতের কঙ্কন প্রার্থনা করিয়া লইয়া উহা বাঁধা দিতে গেল গৃহস্থ মণ্ডলের কাছে, সে লইলনা দেখিয়া দেবীর নির্দেশে পুরাইদত্তের কাছে গেলে পুরাইদত্ত তাহাতে ধর্মের মূর্তি অঙ্কিত দেখিয়া গ্রহন করিল ও কেতুকে অনেক খন্তা-কোদাল দিল। কেতু ফিরিয়া দেবীকে নিজমূর্তি ধরিতে এবং নিজের শতনাম বলিতে অনুরোধ করায় দেবী তাহাই করিলেন। কেতু তখন দেবীর চরণ ধরিয়া ধন দিয়া চলিয়া যাইতে নিষেধ করিল। উভয়ে দাড়িম্বগাছের গোড়ায় যাওয়ার পর কেতু অস্ত্র চালাইয়াও কিছু করিতে পারিলনা, দেবী তখন সেখানে পদাঘাত করিলে একঘাট ধন উঠিয়া আসিল। ঘাটের ভিতর উজ্জ্বলবর্ণের দ্রব্য দেখিয়া কেতু ভাবিল ইহা খাজা নামক মিষ্ট খাদ্যদ্রব্য। পরে দেবী খেজুর ও নারিকেল গাছের গোড়া হইতে তিন তিন ঘাট ধন বাহির করিয়া দিলেন। মোট সাতভাণ্ড ধন ভারে সমান-ভাবে বহন করা কঠিন বলিয়া ভারে ছয়ঘাট নিজে লইয়া একঘাট দেবীকে লইতে অনুরোধ করিল। গৃহে আসিয়া ধন রাখিলেও ধন আপনাআপনিই বাহিরে যাইতে চেষ্টিত দেখিয়া দেবীর নির্দেশে ধনের পূজা করিয়া ধন সুস্থির করিয়া ঘাটগুলির মধ্যে ৮০ মণ স্বর্ণমুদ্রা পাইল।

দেবী কেতুকে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকার আশীর্বাদ দিয়া নগর পত্তন করিয়া মঙ্গল ও শনিবারে বলি দিয়া তাহার পূজা করার নির্দেশ দিয়া কৈলাসে যাইতে চাহিলেন কিন্তু কেতু বলিল তোমার ধন তুমি লইয়া যাও। দেবী তাহাকে পুনরায় অভয় দিয়া এবং স্মরণমাত্রে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়া কৈলাসে চলিয়া গেলেন।

দেবীর আদেশে কেতু বনজঙ্গল কাটাইয়া নগরপত্তন আরম্ভ করিল। বাঘের ভয় ও খোঁড়া শ্রমিকের বিপত্তি দেখিয়া কেতু দেবীকে স্মরণ করিলে দেবী আসিয়া চক্রবাণের আগুনে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া উঁচুনীচু স্থান ছাই দিয়া সমতল করিয়া দিলেন। কেতু নগরে নানা ধরণের ঘরবাড়ী নির্মাণ করিয়া বিভিন্ন মহল তৈরী করিল। পুষ্করিনী, হাতিশাল, ঘোড়াশাল প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া নগরের চারদ্বারে চার প্রহরী নিযুক্ত করিল। দেহরা নির্মাণ করিয়া ব্রাহ্মণদ্বারা দেবীর পূজার অনুষ্ঠান শনিমঙ্গলবারে করিতে লাগিল। এই নবগঠিত গুজরাট নগরে দেবীর নির্দেশে সে রাজা হইয়া বসিল।

বীজমন্ত্র জপিয়া কেতু দেবীকে আহ্বান করিল এবং দেবী আসিলে নগরে বসতিবিস্তারের ব্যবস্থার প্রার্থনা জানাইল। দেবী -

কলিঙ্গ নগরের চারজন মণ্ডলের শিয়রে বসিয়া স্বপ্ন দেখাইয়া নিজের পরিচয় দিয়া নূতন গুজরাট নগরে গিয়া বাস করিতে নির্দ্দেশ দিলেন । তাহারা উদ্যোগী হইতেই ভাড়ু বাধা দিল । নারদের পরামর্শে দেবী ইন্দ্রের নিকট চাহিয়া অষ্টমেঘের মধ্যে কালপাহাড় ও উৎপাতা মেঘ লইয়া কলিঙ্গে আসিলেন। ঝড়বৃষ্টি ও বজ্রপাতে বিচলিত হইলেও ভাড়ু শিব ছাড়িয়া ভবানী পূজিতে রাজী হইলনা । ইন্দ্র মেঘ লইয়া ফিরিয়া গেলেন , ভবানী শিবভক্তের মনোবল দেখিয়া চিন্তিত হইলেন । নারদের পরামর্শে সাঁতালী পর্বতে গঙ্গার কাছে অসময়ে বন্যা চাহিয়া বিফল হইয়া দেবী পুনঃ ইন্দ্রের নিকট গেলেন । ইন্দ্র পরামর্শ দিলেন গঙ্গার দুই পুত্র ডাকডেয়রের সাহায্য লইতে । তাহারাও সাঁতালীতেই বাস করে । দেবীর কথায় তাহারা লক্ষ আঢ়ার ও আঠারো জোয়ারের বন্যা দিলে দেবী তাহা লইয়া কলিঙ্গে আসেন ।তাহাদের আগমনে ছত্রিশ জাতির সব লোক অর্থাৎ প্রজারা গুজরাটে গেল ।রহিল মাত্র ভাড়ু। আশপাশের সমস্ত নদী একত্র হইয়া ভাড়ুর বাড়ী আক্রমন করিল । সব ঘর পড়িয়া গেল ভাড়ু তখন নিজেরের চালে উঠিল কিন্তু সেখানেও স দেখিল বন্যার প্রকোপ দেবী দুইটি কলাগাছ জলের উপর ফেলিয়া দিলে ভাড়ু ভুরা বাঁধিয়া পরিবার-বর্গ ও জিনিষপত্র লইয়া প্রজাদের পিছনে গুজরাটে উপস্থিত হইয়া প্রজাসহ কেতুর সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং খুড়া সম্বোধন করিয়া জানাইল যে সেই সব প্রজা লইয়া আসিয়াছে । কেতু তাহাকে বিদায় দিয়া প্রজাগণকে জাতি অনুসারে বিভিন্ন অঞ্চলে বসাইতে লাগিল । এইভাবে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কৈবর্ত , তেলি, মালী , রোহিলা , তৈলঙ্গ, মোসলমান , মারিচ-মোসলমান , হাড়ি , কারি , পীর , পাঠান , খোজা , কাজি , মোল্লা, শেখ , ফকির , পশরেতা , বৈদ্য, বাণিয়া, গুড়ি, পড়ি , কুড়ি, গোয়াল , কামার , তিয়র, চাড়াল , মাছুয়া প্রভৃতি বসিল ও প্রত্যেক জাতির ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে আধিপত্য রহিল । ঘোড়ায় চড়িয়া কেতু তাহাদের তত্ত্বাবধান করিল । ব্রাহ্মণদ্বারা মঙ্গলচণ্ডীর পূজার ব্যবস্থা করিল । ভাড়ু নগরে তোলা উঠাইবার প্রস্তাব করিলে কেতু রাজী হইলনা তখন ভাড়ু বাজারে ভিক্ষা করার অনুমতি লইল । কিন্তু ভাড়ু বিক্রেতাদের উপর অত্যাচার চালাইলে শেষে এক মাছুয়ানীর নালিশে কেতু ভাড়ুকে ধরিয়া আনিতে বলে । ভাড়ু আসিলে কেতু তাহার শাস্তি বিধান করে । ইহাতে ভাড়ু কেতুকে ব্যাধজাতি বলিয়া অপমান করে এবং শাসায় যে কলিঙ্গ-রাজকে বলিয়া ধরিয়া লইয়া যাইয়া কেতুকে ধুলিয়া কাঠরে বন্দী করিয়া রাখার ব্যবস্থা করিবে ।

শেষে ভাড়ু সুরথ রাজার কাছে গেল ।ভাড়ুর কথায় সুরথরাজ চারমণ্ডলকে ডাকাইয়া কেতুকে ধরিয়া আনিতে আদেশ দিলেন । গুজরাট নগরের চার দ্বার আক্রান্ত হইল - কেতুর সৈন্যেরা পরাভূত হইলে সুরথের সৈন্যরা অন্তঃপুর অভিমুখে রওনা হইল । অন্তঃপুরে কেতু ও ফুল্লরা পাশা খেলিতেছিল। ফুল্লরা বিপদ গণিয়া বলিল দেবীর ধনেই বিপদ ডাকিয়া আনিয়া

সে কেতুকে সুরথের বশ্যতা স্বীকার করিতে অনুরোধ করিল । কেতু তাহা না শুনিয়া চণ্ডীমণ্ডপে পূজা করিতে গেল । পূজায় তুষ্ট হইয়া দেবী আবির্ভূত হইয়া কেতুকে চারি অবতার মূর্তি "হিরিম্বকের চাল" উপহার দিয়া তাহাকে যুদ্ধে যাইতে বলিলেন । কেতু স্ব যুদ্ধে যাইয়া হিড়িম্বকের চাল লইয়া পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিমদ্বারে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়া দক্ষিণদ্বারে আসিয়া চাল ছাড়িয়া শুধু নিজ পৌরুষের উপর নির্ভর করিয়া যুদ্ধে গেলে পরাভূত হইয়া যখন প্রায় বন্দী হয়, তখন হিড়িম্বকের চালের কথা মনে হইল । পুনঃ মনোবল সঞ্চয় করিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে কালুদণ্ডার শেলের আঘাতে ভূপাতিত হইল । দেবী তখন তাহার উপর ভর করিয়া শেল-পাট টানিয়া খুলিলেন । ছিন্নমস্তা দেবীর আবির্ভাবে বিপক্ষীয় পাইক সকল ভয় পাইয়া পলাইল এবং অন্তে কেতু চারদ্বারই জয় করিল ।

কেতু ফুল্লরাকে জানাইল যে নিজ বাহুবলেই সে যুদ্ধে জয়-লাভ করিয়াছে । ইহাতে দেবী ব্যথিত হইয়া কেতুকে ছাড়িয়া সুরথকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিলেন । সুরথের পূজাকালে আবির্ভূত হইয়া ভবানী তাহাকে নির্দেশ দেন কেতুকে বন্দী করিতে । এই নির্দেশ রাজা সুরথ না শুনিলেও পূজারী শুনিয়া রাজার নিকট বলিল । পুরোহিত ও ভাড়ু রাজার নির্দেশে যাইয়া ফুল্লরাকে ছলনা করিয়া এবং কেতুকে বন্দী করিয়া সুরথের নিকট আনিল । সুরথ তাহার বিচার (নগরভাঙ্গার) পরে হইবে বলিয়া আপাততঃ বন্দীশালায় কেতুকে ফেলিয়া রাখিল ও নানা যন্ত্রণা দেওয়ারও ব্যবস্থা করিল । যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া কেতু দেবীর চৌতিশা স্তব করিলে দেবী সদয় হইয়া সুরথরাজাকে স্বপ্নযোগে নানা শাস্তি দিয়া ভক্ত কেতুকে মুক্ত করিতে বলিলেন । সুরথ কেতুকে মুক্ত করিয়া দিলে কেতু তাহার বিচ্ছেদে শোকমগ্না ফুল্লরার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইল এবং ভাড়ুর শাস্তি-বিধান করিয়া নগরমধ্যে ছাড়িয়া দিল । নগরের লোকেরাও ভাড়ুকে শাস্তি দিল ।

ফুল্লরা ও কেতু পুত্রবাঞ্ছায় গঙ্গাতীরে যাইয়া দেবীর আরাধনা করিতে থাকিলে দেবী তাহাতে সম্মত না হইয়া তাহাদের পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন । তখন চণ্ডীর নির্দেশেই উভয়ে তাহারা অগ্নিকুণ্ড প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করিলে দেবী তাহাদিগকে দেব শরীর দান করিয়া স্বর্গে পাঠাইলেন । ইন্দ্র তাহাদিগকে সানন্দে গ্রহণ করিলেন । দেবী কৈলাসে গেলেন এবং পরবর্তী চারিদিনের পূজা প্রচারের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন । তখন নারদ আসিয়া দেবীকে যুক্তি দর্শাইল ।

কাহিনী - শেষ অংশ।

কালকেতু কেন্দ্রুক ব্রতকথা মর্ত্তে চারদিনে শোনার ব্যবস্থা হইল, বাকী চারদিনের ব্যবস্থা হইলেই অষ্টমঙ্গলা ব্রতগীত ব্যবস্থাপিত হয়। কিভাবে ব্যবস্থা করা যায় সেই ভাবনায় দেবী যখন বিমনা তখন নারদের উপদেশে নলকুবেরের পুত্র কর্ণমুণিকে মর্ত্তে লইয়া গিয়া ব্যবস্থা করিতে মনস্থ করিলেন। শিবের সহিত পাশাখেলার মধ্যস্থ হইলেন কর্ণমুণি। দেবীর প্ররোচনায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে শিব তাহাকে শাপ দিলেন নরের উদরে জন্মিবে বলিয়া। দেবী তাহার জীব আঁচলে বাঁধিতে শিব সব ব্যাপার বুঝিয়া পুনঃ কর্ণমুণিকে জীবদানের উদ্যোগ করিতেই দুর্গা টের পাইয়া শিবকে অনুনয় বিনয় করিয়া তাহার মর্ত্তে জন্মাইবার পথ পরিস্কার করিয়া লইলেন। ইহাতে মুণির ক্রন্দন দেখা দিলে দুর্গা তাহাকেও সান্ত্বনা দিলেন। অতঃপর ভবানী তাহার জীব লইয়া গিয়া উজানীনগরের বণিক জয়পতির স্ত্রী উর্ব্বশীর গর্ভে সঞ্চার করিয়া দিলেন।

দশমাসদশদিন পর সেই গর্ভে যে পুত্র জন্মিল তাহার জাতকর্ম্মক্রিয়া করিয়া নাম রাখা হইল সাধু ধনপতি। ধনপতির সাত বৎসর বয়সে নিধুপতির ঘরে জন্ম হইল লহনার। লহনা সাত বৎসর বয়স হইতেই গৌরী পূজা আরম্ভ করে ভাল বর ও ঘরের কামনায়। একদিন দুর্গা ব্রাহ্মণী বেশে আসিয়া ধনপতি তাহার বর হইবে বলিয়া বর দিয়া গেলেন। কুলব্রাহ্মণের সহায়তায় নিধুপতি উজানীর ধনপতির সহিত কন্যা লহনার বিবাহ স্থির করিয়া বিবাহ সম্পন্ন করিলেন। ধনপতি লহনা সহ উজানীতে ফিরিয়া সুখে কালযাপন ~~করিতে~~ করিতে লাগিলেন। কালক্রমে ধনপতির পিতা জয়পতি পরলোক গমন করেন। ধনপতি ভোমরার তীরে তাহার দাহকার্য সমাপন করেন এবং একমাসে ক্রিয়া-কার্য্যাদি সমাপন করেন।

স্বামী ও সম্পদ পাইয়া লহনা গৌরী পূজা ভুলিয়া গেলেন। দেবী তাহাকে বন্ধ্যাত্বের অভিশাপ দিয়া খণ্ডব্রতের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। একসময় নারদের পরামর্শে রত্নমালা নামক ইন্দ্রনর্ত্তকীকে মর্ত্তে জন্মাইবার জন্য ইন্দ্রভুবনে দেবী গেলেন। দুর্গার নৃত্য দেখার ইচ্ছাপূরণের জন্য ইন্দ্র মাতুলিকে পাঠাইয়া অনিচ্ছুক রত্নমালাকে আনাইয়া নৃত্য করিতে বলিলেন। রত্নমালা তাহার পুত্র মালাধর ও পুত্রবধূদ্বয় উলুপা দুলুপা সহ নৃত্যের আসরে আসিলেন। একবার গন্ধার রাগ গাহিবার সময় এবং দ্বিতীয়বার সন্তপরাতে নৃত্যকালে রত্নমালার তালভঙ্গ হইল। ইন্দ্র রত্নমালাকে নরের উদরে জন্মের অভিশাপ দিলেন। রত্নমালার ক্রন্দনে ইন্দ্র পুনঃ বলিলেন ২৮ বৎসর পর সে স্বর্গে ফিরিয়া আসিবে। রত্নমালা অগ্নিকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করিলে স্বামী জয়ধর, পুত্র মালাধর ও পুত্রবধূ উলুপা দুলুপা শোকে মুহ্যমান হইল। ইন্দ্র তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিলেন।

দেবী রত্নমালার জীব লইয়া ইছানীনগরের সতী রম্ভার উদরে জীব সঞ্চার করিলেন। রম্ভা যথাকালে কন্যা প্রসব করিলে জাতকর্ম অনুষ্ঠিত হইল। একমাসের সময় কন্যার নামকরণ হইল খুল্লনা। ক্রমে খুল্লনা সাত বৎসরের হইলে দেবী তাহার বিবাহের ব্যবস্থাপনার জন্য পরোক্ষ একটি উপায় অবলম্বন করিলেন। যদিও তাহার লক্ষিত বর দোজবর ধনপতি। দেবী উজানীর রাজা বিক্রমকেশরীকে স্বপ্নে নির্দেশ দিলেন আটকুড় ধনপতিকে রাজসভায় আসিতে বারণ করিতে। যথাকালে ধনপতিকে রাজা বলিলেন পুনর্বার বিবাহ করিয়া বংশরক্ষা করিতে এবং তাহার পূর্বে তাহার রাজসভায় প্রবেশ নিষেধ করিলেন। সাধু আপত্তি উত্থাপন করিলে রাজা কোটালকে দিয়া XXXXX তাহাকে রাজসভা হইতে বহিষ্কার করিলেন। ধনপতি গিয়া লহনাকে একথা বলায় লহনা বলে সন্তানহীনতার জন্য দায়ী স্বামী নিজেই। ধনপতি স্ত্রীর উক্তিতে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া পায়রা উড়াইতে মনোনিবেশ করিল এবং বাড়ীর বাহিরে গেল। সঙ্গে নানা খাঁচায় নানান্ ধরণের পায়রা,. ক্রমে চলিতে চলিতে সাধু ধুলিয়া ময়দানে উপস্থিত হইলে হরিদত্ত সাধুর সহিত দেখা হইল। পায়রা উড়ান প্রতিযোগিতায় হরিদত্ত ও ধনপতি এই প্রতিজ্ঞা করিল যে যে হারিবে সে লক্ষটাকা প্রতিপক্ষকে দিবে। পায়রা উড়াইয়া ধনপতির জয় হইল। ধনপতির পায়রাটি জয়লাভের পর অপরিষ্কার আকাশে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া লক্ষপতির গৃহে গিয়া অধিষ্ঠান করিল। খুল্লনা সুন্দর পায়রাটি দেখিয়া ডাকিল, পায়রাটি আসিয়া তাহার আঁচলে প্রবেশ করিয়া তলাকার কাঁচুলী ছিঁড়িয়া ফেলিল। জিজ্ঞাসা করিলে পায়রা বলিল তাহার প্রভু ধনপতি খুল্লনার স্বামী হইবে। এদিকে ধনপতিও পায়রার খোঁজে সেখানে গেল। সখীর সঙ্গে পায়রা লইয়া ক্রীড়ারত খুল্লনাকে দেখিয়া সাধু তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল খুল্লনা লজ্জা পাইয়া গৃহাভিমুখে চলিলে ধনপতিও তাহার পিছু লইয়া লক্ষপতির গৃহাঙ্গনে উপস্থিত হইলে লক্ষপতি তাহাকে দেখিতে আসিল। ধনপতি লক্ষপতিকে প্রণাম করিয়া জলপান করিতে চাহিলে লক্ষপতি স্ত্রী রম্ভার নিকট যাইয়া জলের কথা বলিল। তখন রম্ভা ও খুল্লনা জল আনিতে গেল এবং ধনপতি লক্ষপতিকে জিজ্ঞাসা করিয়া খুল্লনার পরিচয় পাইল এবং তাহার বিবাহের কথা আলোচনা করিল। ধনপতি বিবাহ করার প্রস্তাব করিলে নিজের ভাইঝির সহিত পূর্ব বিবাহের কথা স্মরণ করাইয়া অস্বীকার করিল। অবশেষে ঘটকব্রাহ্মণের মধ্যস্থতায় এই বিবাহই ঠিক হইল। প্রতিবেশিনীরা যথারীতি স্বামীনিন্দা করিয়া ধনপতির রূপগুণের প্রশংসা করিল। নারীরা যোগের কথাও উল্লেখ করিল যাহাতে বরকন্যার ভালবাসার ছেদ না পড়ে। বাড়ী ফিরিয়া ধনপতি লহনাকে বিবাহের কথা বলিলে লহনা প্রথমে অস্বীকার করিল ও পরে গহনার প্রলোভনে আশ্বস্ত হইয়া সম্মতি দিল এবং নিজেই খুড়ার নিকট গিয়া বিবাহ ঠিক করিয়া আসিল। যৌতুকপ্রাপ্তিসহ মহানন্দে বিবাহ হইয়া গেল। খুল্লনা হেটমুণ্ডে সপ্তপাক দিয়া বরের গলায় মালা দিল এবং ধনপতিও খুল্লনার গলায় মালা দিয়া বাসরঘরে ক্ষীরভোজন করিয়া রজনী পোহাইল।

রজনী প্রভাতে বিবাহের অন্যান্য অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে রম্ভা অশ্রু-বিসর্জন করিতে করিতে কন্যাকে নানা উপদেশ দিল। শেষে দোলায় চড়িয়া বরকন্যা উজানীতে আসিলে সকলেই আনন্দিত হইল। এবং সুখে রাত্রিযাপন করিয়া পরদিন প্রভাতে রাজদরবারে গেলে তাহার গায়ের হলুদ দেখিয়া রাজা প্রশ্ন করিল সে বলিল তাহার অপবাদ ঘুচাইবার জন্য সে পুনঃ বিবাহ করিয়াছে। এই বিবাহের কোন সংবাদ না পাওয়ায় রাজা রুষ্ট হইয়া ধনপতিকে বন্দী করিলেন। দুর্গার অভিপ্রায় এই খুল্লনাকে দিয়া পূজা প্রচার করা এবং সাধুকে গৌড়ে পাঠাইয়া খুল্লনাকে দিয়া বনে ছাগল চরানো। এই দুই কাজের উপলক্ষ হইল উজানীরাজ বিক্রমকেশরের সোনার খাঁচার প্রয়োজন দেখা দেওয়ায়। এই প্রয়োজন সৃষ্টির জন্য পদ্মার নির্দেশে দুর্গা ইন্দ্রপুরে গেলেন এবং নৃত্য দেখিতে চাহিলেন। ইন্দ্র পুষ্পদন্ত ও বিদ্যাকান্ত নামক দুই নর্তককে নৃত্য করিতে বলিলে নৃত্যকালে তাহাদের অশিষ্ট আচরণের জন্য ইন্দ্র শাপ দিলেন মর্তে বার বৎসর শারী শুকপক্ষী হইয়া বাস করিতে হইবে এবং সোনার খাঁচার স্পর্শ পাইলে তাহাদের মুক্তি হইবে। ক্রমে তাহারা শারী শুকে পরিণত হইয়া শ্রীবৎসরাজার কাছে গেল। সন্ন্যাসীবেশী শনির দৃষ্টিতে তাহার রাজ্যপাট নষ্ট হইতে থাকিলে তিনি শুকশারী, রানী ও কিছু ধন লইয়া রাজ্য ছাড়িয়া গেলেও শনি পিছনে লাগিয়া থাকিল। শেষে ভৃগুমুনির নির্দেশে পাখী দুই-টিকে ছাড়িয়া দিলে রাজার ভাগ্য ফিরিল, তিনি স্বরাজ্যে গেলেন।

ক্রমে পাখী দুইটি আসিল উজানীরাজ বিক্রমকেশরের হাতে। যক্ষে তাহারা বনে থাকাকালে উৎপাত নামে দুইব্যাধ তাহাদিগকে ধরিয়া এই রাজার কাছে আনে। রাজা পাখীর মুখে তাহাদের পরিচয় জানিয়া ~~স্বর্ণ~~ স্বর্ণপিঞ্জর গঠনের জন্য ধনপতিকে গৌড়ে পাঠাইয়া পিঞ্জর গড়িয়া আনার আদেশ দিলেন। ধনপতি প্রথমে অস্বীকার করিলেও শেষপর্যন্ত রাজী হইয়া ৫০০ শত মোহর এবং পাইক প্রভৃতিসহ ১০০ জন লোক লইয়া গৃহে যাইয়া খুল্লনাকে লহনার হাতে সমর্পন করিয়া দোলারোহণে গৌড় যাত্রা করিল। ১ম দিন বনগ্রাম, ২য় দিন সিমলানগর, ৩য় দিন শীতলপুরে কাটাইয়া চতুর্থ দিনে গৌড়ে পৌঁছিল। গৌড়ের রাজা ধনেশ্বর ধনপতির উদ্দেশ্য জানিয়া তাহা দিতে সম্মত হইয়া তাহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া ধনপতিকে গৌড়ে রাখিলেন এবং পিঞ্জর তৈরীও আরম্ভ হইল।

এদিকে উজানীতে লহনা সতিনী বা বোন খুল্লনার রূপযৌবন দেখিয়া ভাবিল স্বামী তাহাতেই আকৃষ্ট থাকিবে, লহনাকে আদর করিবেনা। দুর্বুদ্ধির বশীভূত হইয়া সে খুল্লনাকে কষ্ট দেওয়ার পথ খুঁজিতে লাগিল — যাহাতে তাহার রূপযৌবনের জৌলুস নষ্ট হইয়া যায়। তাই দুর্বলা দাসীর সহিত যুক্তি করিয়া ব্রাহ্মণী সই লীলাবতীকে আশ্রয় করিল। লীলাবতী নানা 'যোগ' ও ওষধিগুণাগুণ জানিত। শেষে তাহারা স্থির করিল জালপত্র রচনা করিয়া খুল্লনাকে দিয়া বনে ছাগল চড়াইতে হইবে।

জালপত্র লেখা হইলে লহনা তাহা হাতে লইয়া কাঁদিতে লাগিল, খুল্লনা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে ধনপতির পত্র বলিয়া উল্লেখ করিল। খুল্লনা ইহা বিশ্বাস না করিয়া বলিল ইহা লীলাবতীর জাল করা পত্র। ইহা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া লহনা খুল্লনার গহনাপত্র কাড়িয়া লইয়া অনেক ছাগল সহ তাহাকে বনে পাঠাইল। দিনান্তে নিকৃষ্ট খাদ্য ও ভাঙ্গাঘরে শয়ন ব্যবস্থা করিল। বনে ঝড়বৃষ্টিতে খুল্লনার দুর্দশার সীমা রহিলনা। ক্রমে তাহার ভাগ্যে পোড়া ভাত ও ঢেকীশালে শয়ন জুটিল। ভাত সে খাইতে পারিলনা এবং চাটিপোকার কামড়ে ঘুমও হইলনা। কষ্ট ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিলে খুল্লনা দুবলা দাসীকে তাহার বাপের বাড়ী খবর দিতে পাঠাইল। দুবলার মুখে সব কথা শুনিয়া মা রম্ভা ছেলে হরি বাণিয়াকে বস্ত্র ও অলঙ্কার সহযোগে খুল্লনার নিকট পাঠাইল। বস্ত্রহীনা খুল্লনা ঝোপের আড়ালে লজ্জা নিবারন করিয়া ভাইএর দেওয়া বস্ত্র অলঙ্কার লইল। বাড়ী গেলে লহনা সেগুলিও কাড়িয়া লইল এবং গালাগালি দিতে লাগিল। দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে খুল্লনা ঘুমাইয়া পড়িল। এই সুযোগে দুর্গা হনুমানকে পাঠাইয়া খুল্লনার ছাগলগুলি সেজুতি পর্বতে লুকাইয়া রাখিয়া স্বয়ং ভ্রমর রূপ ধারণ করিয়া দেবী ঘুমন্ত খুল্লনার কানের কাছে গুনগুন করিয়া তাহার নিদ্রা ভাঙ্গাইলেন। নিদ্রাভঙ্গে খুল্লনা ছাগল না দেখিয়া চতুর্দিকে তল্লাস করিতে লাগিল। উত্তরে বাঘ এবং পশ্চিমে ভল্লুক ও পূর্বে সর্প দেখিয়া ছাগলও না পাইয়া তাহাকে খাইয়া ফেলিতে তাহাদিগকে অনুরোধ করিল। কিন্তু তাহারা কেহই তাহাকে খাইতে রাজী হইলনা যেহেতু সে দুর্গার ব্রতদাসী।

তখন খুল্লনা দক্ষিণ দিকে যাইয়া পঞ্চ বিদ্যাধরীকে ব্রতপূজা করিতে দেখিল। তাহাদের নির্দেশে স্নান করিয়া আসিয়া সেই ব্রতে বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলে বিদ্যাধরীরা স্বর্গে চলিয়া গিয়া দুর্গাকে এই বৃত্তান্ত জানাইল। দুর্গা তখন ব্রাহ্মণীর মূর্তি ধরিয়া সেখানে আসিয়া খুল্লনাকে শিব পূজা করিতে বলিলেন। কিন্তু খুল্লনা অস্বীকার করায় দুর্গা কার্তিক গণেশ লক্ষ্মী সরস্বতী সমন্বিত দশভুজা সিংহবাহিনী ও মহিষমর্দিনীরূপে দেখা দিলেন। খুল্লনা তাহার চরণে প্রণিপাত করিল। দেবী বর দিলেন ছাগল পাইবে। বাঘ ভালুক সর্প লহনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে তিনি তাহাকে স্বপ্ন দিতে রাজী হইলেন। লহনাকে স্বপ্নে ভবিষ্যতের জন্য শাসাইয়া দিলে লহনা খুল্লনার প্রতি সদয় ব্যবহার আরম্ভ করিল এমনকি অতি আদরও দেখাইতে লাগিল।

দুর্গা খুল্লনাকে আর দুঃখ না দিয়া স্বামীর সহিত মিলন ঘটাইতে মনস্থ করিয়া গৌড়ে ধনপতিকে ও উজানীতে খুল্লনাকে পরস্পরের জন্য লালায়িত করিয়া স্বপ্ন দেখাইলেন। খুল্লনা জাগিয়া বলিল আর চারিদিনের মধ্যে স্বামী না আসিলে সে গরল খাইবে। ইহাতে দুর্গা শ্বেত কোকিলের রূপ ধরিয়া গান আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ইহার ফল হইল বিপরীত খুল্লনার ক্রন্দন বাড়িল। দেবী তখন শ্বেতকাকের মূর্তি ধারণ করিলেন। খুল্লনা এই কাককে জিজ্ঞাসা করিলে কাক বলিল স্বামী আসিবে। দেবী খুল্লনার রূপে ধনপতির স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া জানাইলেন দুই একদিনের মধ্যে উজানীতে সে না আসিলে খুল্লনা প্রাণত্যাগ করিবে।

ধনপতি ব্যস্ত হইয়া গৌড়রাজ ধনেশ্বরকে অনুরোধ করিলে তিনি কারিগরকে তাগিদ দিয়া স্বর্ণপিঞ্জর নির্মাণ শেষ করিয়া ধনপতিকে দিলেন। ধনপতি কারিগরকে লক্ষ তঙ্কা দিল। রাজার নিকট বিদায় লইয়া ধনপতি উজানীর দিকে রওনা হইল। ধনেশ্বর ধনপতিকে আগাগোড়া অতি আদরেই রাখিয়াছিলেন, কিন্তু স্বপ্নে খুল্লনার রূপ যৌবনের গৌরব দেখিয়া সে আর গৌড়ের আপ্যায়ন ও সৌজন্য আবদ্ধ থাকিতে পারিলনা। উজানীরাজ বিক্রমকেশর স্বর্ণপিঞ্জর পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া পাখী দুইটিকে তাহাতে রাখিতেই তাহারা উড়িয়া গেল। রাজা ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া ধনপতিকে বন্দী করিলেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া পাখীরা ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের শাপ বৃত্তান্ত জানাইলে রাজা ধনপতিকে ছাড়িয়া দিলেন। ধনপতি বাড়ী যাইয়া স্বজনদের সহিত মিলিত হইলেন।

দুর্বলা দাসী খুল্লনাকে জানাইলে সে মনোরমবেশে সজ্জিত হইয়া স্বামীর সাক্ষাতে গেলে ধনপতি রন্ধনের কথা বলিল। খুল্লনা রন্ধনান্তে স্বামীকে আহার করাইল। ধনপতি মুখশুদ্ধি করিয়া শয্যায় যাইয়া নিদ্রিত হইল। খুল্লনা স্বামীর পার্শ্বে শয়ন করিয়া তাহার নাক টিপিয়া তাহাকে জাগাইলে ধনপতি আলিঙ্গন চাহিল, খুল্লনা বলিল আগে তাহার দুঃখের কথা শুনিতে হইবে। ধনপতি সব শুনিয়া তাহাকে সব ভুলিয়া যাইতে বলিল এবং খুল্লনাকে আলিঙ্গন করিল। এদিকে ইন্দ্রসভায় নৃত্যের তালভঙ্গদোষে মালাধর নর্তককে ইন্দ্র শাপ দিলেন বার বৎসর মর্ত্তবাসের। মালাধর প্রাণত্যাগ করিলে তাহার দুই স্ত্রীও প্রাণত্যাগ করিল। দুর্গা এই তিনজনের জীব লইয়া মর্ত্তে আসিয়া মালাধরের জীব খুল্লনার গর্ভে, তাহার একস্ত্রীর জীব সিংহলরাজের স্ত্রী নীলাবতীর গর্ভে ও অপর স্ত্রীর জীব উজানীরাজ বিক্রমকেশরের স্ত্রীর গর্ভে সঞ্চার করিয়া দিলেন। মালাধরের নাম শ্রীমন্ত ও স্ত্রীদুয়ের নাম যথাক্রমে সুশীলা ও জয়া হইল।

পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ধনপতি সমস্ত জ্ঞাতিবর্গকে নিমন্ত্রন করিল। সবচেয়ে সম্মানযোগ্য বলিয়া চান্দসদাগরকে মনোনীত করিয়া তাহাকেই মালাচন্দন অর্পন করিল। ইহা শঙ্খদত্ত অনুমোদন না করিয়া চান্দ সদাগরের নিন্দাবাদ করিল। বিষ্ণুদত্ত ও ইহাতে অসন্তুষ্ট হইল এবং এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে বদ্ধপরিকর হইল। খুল্লনা বনে ছাগল চড়াইয়া জাতিনষ্ট করিয়াছে সুতরাং তাহার গৃহে আহার করা হইবেনা বলিয়া ঘোষনা করিল। ধনপতি গৃহে যাইয়া লহনার জালপত্র রচনার জন্য তাহাকে দোষ দিয়া প্রাণত্যাগ করিতে চাহিলে খুল্লনা শুনিয়া বলিল আমি জ্ঞাতিস্থানে পরীক্ষা দিয়া দেখাইব যে আমার জাতিকুল নষ্ট হয় নাই। ধনপতি বলিল তুমি ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ দোষ কিছু করিয়াছ কিনা - করিয়া থাকিলে আমি লক্ষ তঙ্কা দিয়া জ্ঞাতিদিগকে ভোজন করাইব। খুল্লনা বলিল তাহাতেও তো আমার কলঙ্ক ঘুচিবেনা অতএব সে পরীক্ষাই দিবে। ধনপতি জ্ঞাতিগণকে একথা জানাইলে তাহারা রাজী হইল।

পরীক্ষার উদ্যোগ চলিল। খুল্লনা গঙ্গাস্নান করিয়া শুদ্ধচিত্তে ভবানী পূজার আয়োজন করিয়া পূজা করিল। দেবী আবির্ভূতা হইয়া কারণ জানিতে চাহিলে খুল্লনা পরীক্ষার ব্যাপার বলিল। ভবানী অভয় দান করিলেন। খুল্লনা জ্ঞাতির সম্মুখে উপস্থিত হইলে বিষ্ণুদত্ত বলিল উচ্চে উচ্চে এইসকল পরীক্ষা দিতে যথা - সাজি, তপ্ত শাবল, বিষধর সর্প, তুলাদণ্ড, তুষের তৈল নৌকা, শানিত ক্ষুরের পরীক্ষা। পরীক্ষায় খুল্লনাকে উত্তীর্ণা দেখিয়া বিষ্ণুদত্ত বলিল সবস্থানেই সে যাদু খাটাইয়াছে বা অন্যকোন উপায় অবলম্বন করিয়াছে তাই ইহাতে তাহার সতীত্বের পরীক্ষা হইলনা। তখন উঠিল অগ্নি পরীক্ষা বা জতুগৃহ পরীক্ষার কথা। খুল্লনা কাঁদিল, দেবী পার্বতী অভয় দিয়া বিশ্বকর্মাকে দিয়া জতুগৃহ নির্মাণ করাইলেন। ধনপতি এই ভীষণ পরীক্ষার বদলে খুল্লনার সমান ওজনের রজতকাঞ্চন দিতে প্রস্তুত হইলেও জ্ঞাতিরা রাজী হইলনা। পরীক্ষা চলিল দেবতারাও সবাহন আকাশে আসিলেন। দুর্গা নিজেও সে আগুনের কাছে যাইতে না পারিয়া শিবকে সাহায্য করিতে বলিলে শিব বলিলেন দুর্গা শিবভক্ত রাবণকে বিনষ্ট করিয়াছে সুতরাং তিনি সাহায্য করিবেননা। দুর্গা উগ্রমূর্তি ধরিলে শিব দুর্গাসহ ব্রহ্মার নিকট গেলেন। ব্রহ্মা ব্রহ্মমন্ত্রে অগ্নি শীতল করিয়া খুল্লনাকে অক্ষত রাখিলেন।

এদিকে রাজা এই সংবাদ পাইয়া আসিয়া জ্ঞাতিবর্গকে শাসাইলেন - খুল্লনা মরিলে প্রত্যেককে বধ করিবেন বলিয়া। জ্ঞাতিরা তখন ভয়ে ভস্মের মধ্যে জল ঢালিয়া খুল্লনাকে খুঁজিতে লাগিল। ধনপতি খুল্লনাকে পাওয়া যাইতেছে না দেখিয়া ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে লাগিল। এমন সময় জ্ঞাতিরা দেখিল আগুনের মধ্যে খুল্লনা রহিয়াছে, তাহার কেশ হইতে গঙ্গাজল পড়িতেছে এবং তাহার বর্ণ আরও উজ্জ্বল হইয়াছে। তখন বিষ্ণুদত্ত সহ সকলে মা বলিয়া তাহার চরণে পড়িল ও ক্ষমা প্রার্থনা করিল। এবং সকলেই তাহার হস্তের অন্ন খাইয়া পবিত্র হইতে ইচ্ছা করিল। খুল্লনা রন্ধন না জানিলেও ভবানীর সাহায্যে খুব ভালরন্ধন করিল। জ্ঞাতিরা ভোজন শেষে বিদায় লইল। পরদিন প্রাতে ধনপতি রাজাকে ভেট প্রদান করিল।

এবারে পার্বতী পদ্মার সহিত যুক্তি করিতে থাকেন কি করিয়া ধনপতিকে দক্ষিণপাটনে পাঠান যায়। উপায় বাহির হইল - নেপালকে দিয়া রাজগৃহ হইতে চন্দন চুরি করাইয়া দেবী রাজার বুকে বিষবাণ মারিলেন। রাজা চন্দনের সন্ধানী হইয়া কোতোয়ালকে দিয়া চন্দনের সন্ধান করিয়াও তাহার যাতনা উপশমের জন্য কোথাও একবিন্দু চন্দন পাইলেন না। সিংহল হইতে ধনপতি চন্দন আনিয়া থাকে জানিয়া ধনপতিকে ডাকাইয়া রাজা তাহাকে সিংহল হইতে চন্দন আনিয়া দিতে বলিলেন। সাধু বলিল এই গৌড় হইতে আসিলাম আবার সিংহল যাইতে হইবে, রাজা ছাড়িলেননা যাইতেই হইবে। সাধু বিষন্নবদনে গৃহে ফিরিলে খুল্লনা বিষাদের কারণ জানিয়া তাহাদের নিজেদের গৃহের চন্দন দিতে বলিল। কিন্তু লহনা উগ্রমূর্তি ধরিয়া বাদ সাধিল। সাধু পাটনে যাওয়াই ঠিক করিলে খুল্লনা সঙ্গে যাইতে চাহিল।

সাধু দূরদেশে তাহাকে লইতে সম্মত হইলনা। খুল্লনার ভয় পাছে আবার সতিনী ছাগল চরানোর ব্যবস্থা করে। শেষে খুল্লনা ও লহনাকে বুঝাইয়া সাধু পাটনে যাওয়ার জন্য বাড়ীর বাহির হইল। সাধু অম্বরার ঘাটে গিয়া মৃত্তিকানির্ম্মিত শিব পূজা করিয়া প্রনাম করিল। খুল্লনাও স্নান,তর্পন ও সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া সাধুর মঙ্গলার্থে ভবানী পূজায় বসিল। পূজা টের পাইয়া পদ্মার পরামর্শে দেবী পঞ্চদাসী সহ সিংহপৃষ্ঠে আরোহন করিয়া উজানীতে আসিয়া মানবী মূর্ত্তি ধরিয়া খুল্লনাকে তাঁহাকে ডাকার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। কথাবলার শব্দ কানে যাওয়া মাত্র লহনা অম্বরার ঘাটে যাইয়া ধনপতিকে খুল্লনার তপশ্চর্য্যা দেখিয়া যাইতে বলিল। ইহাতে ধনপতি ক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়া দুর্গার ঘট দেখিয়া বাম পায়ের আঘাতে ঘট দূরে ফেলিল এবং খুল্লনাকে বলিল শিবের পূজা কর, তাঁহার কৃপায় মায়াদুর্গার ভয় ধনপতির নাই। ইহার ফলে যাত্রার শুভ লগ্ন অতিক্রান্ত হইলেও ধনপতি নানা অমঙ্গলসূচক ব্যাপারের মধ্যেই যাত্রা করিল। খুল্লনা পুনরায় ঘটস্থাপন করিয়া বীজমন্ত্র জপিয়া পূজা করিলেও দেবী প্রসন্ন হইলেন না। খুল্লনার সন্দেহ স্বামীর জীবন সংশয়, তাই সে মস্তকের চুল দিয়া চামর তৈরী করিয়া ঘটে বাতাস দিল, পীঠের চামড়া কাটিয়া চান্দোয়া বানাইল, দশ অঙ্গুলী কাটিয়া পাষাণ সাজাইল- জিহ্বা কাটিয়া সলিতা পাকাইল, দুইটি কান কাটিয়া খর্পর সাজাইল, পায়ের মাংস কাটিয়া রক্তের ধারে ভরিল, ঘৃতে মাংস মাখিয়া ঘটে দিল, কিন্তু এততেও মঙ্গলচণ্ডী সন্তুষ্ট হইলেননা। তবে আড়ালে থাকিয়া মাতা পূজা দেখিতে লাগিলেন। শেষে খুল্লনা গলায় কাটারী দিয়া মরার উদ্যোগ করিতে দেবী তাহার হস্ত ধরিয়া বারণ করিলেন এবং বলিলেন তোমার জন্যই তোমার স্বামীকে মারিবনা তবে তাহাকে দুর্গতি পোহাইতে হইবেই। মগরাতে তাহার নৌকা ডুবাইব কালিদহে কমলেকামিনী দেখাইয়া সেইসূত্রে বন্দী করাইব। বুকে পাথর দিয়া তথায় অনাহারে বারবৎসর রাখিব এবং দৈনিক কিছু দুর্গতিও তাহাকে ভোগ করাইব। ইহা শুনিয়া খুল্লনা মাথার কেশ দিয়া দেবীর চরণ জড়াইয়া ধরিল। দুর্গা তাহাকে পুত্রবর দিয়া কৈলাসে গেলেন। ধনপতি দৈবজ্ঞ ডাকিয়া বিচার করিয়া তাহার মুখে পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বপ্রকার দুর্গতির কথাই শুনিলেন। দৈবজ্ঞ অধিকন্তু বলিলেন তোমার পুত্র তোমাকে উদ্ধার করিয়া আনিবে। ইহা শুনিয়া ধনপতির মাথা ঘুরিয়া গেল এবং তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া নৌকাবাহক দিয়া গলাধাক্কা দিয়া দৈবজ্ঞকে দূর করিয়া দিলেন।

যাত্রাকালে ধনপতিকে খুল্লনা জয়পত্র লিখিয়া দিতে বলিল- যাহাতে পরে তাহাকে দ্বিচারিনী হইতে না হয়। ধনপতি জ্ঞাতিবর্গকে ডাকিয়া নিজ পরিচয় দিয়া লিখিল যে - খুল্লনার পঞ্চ মাস গর্ভকালে সে প্রবাসে যাইতেছে। পুত্র জন্মিলে শ্রীমন্ত নাম রাখিয়া দনাই পণ্ডিতের কাছে লেখাপড়া শিখাইয়া পিতার উদ্দেশ্যে দক্ষিন পাটনে পাঠাইবে আর কন্যা হইলে দুলুবী নাম দিয়া কুলীন ঘরে বিবাহ দিবে এবং জামাতা শ্বশুরের উদ্দেশ্যে দক্ষিণপাটনে যাইবে।

সাক্ষী হইল পণ্ডিত জনার্দন, বাণিয়াগণ ও বুলান কাণ্ডার। ধনপতি জয়পত্র খুল্লনার হাতে দিয়া সপ্তডিঙ্গা দ্রব্যসম্ভারে পূর্ণ করিয়া ও শ্রীহরিস্মরণ করিয়া পাবরগণ সহ নৌকা ছাড়িয়া দিল। উজানী নগরের ভ্রমরার ঘাট হইতে নৌকা ছাড়িয়া শঙ্খ নদী, খুরাই-চুরাই, গঙ্গাসুরেশ্বরী, অম্বুয়া মুলুক, বোগাইচণ্ডী, কোদালিয়ার ঘাট, নদীয়া শান্তিপুর, ভীমঘাটা, কুমারপুর প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া মগরাদহতে পড়িল। দুর্গা ও ইন্দ্রের সাহায্যে অষ্টমেঘ ও ঊনপঞ্চাশ পবন ও হনুমানকে সঙ্গে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া ঝড় বৃষ্টি শীলাপাতে তথা নদীসমূহের উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে ধনপতির ছয়ডিঙ্গা ডুবাইলেন নাবিকেরা জলে ভাসিতে লাগিল। হনুমান ধনপতির নৌকা ডুবাইতে চেষ্টা করিলে দেবী তাহার ব্রতের জন্য নিষেধ করিলেন এবং জলে ভাসমান পাবর-দিগকে উঠাইয়া দিতে বলিলেন। হনুমান তাহাদিগকে উঠাইলে দৈবজ্ঞের কথা অক্ষরে ধনপতির মনে পড়ায় ~~তিনি~~ বাড়ী ফিরিতেই মনস্থ করিলেন। পদ্মার নির্দেশে দেবী জানাইলেন সম্মুখেই তো সিংহল দেখা যায়, তখন আবার ধনপতি মত পরিবর্তন করিয়া নাবিকদিগকে নৌকা বাহিতে বলিল এবং ক্রমে তাহারা ইন্দ্রানী নগরে আসিয়া উপনীত হইল। ইহার পর সপ্তগ্রাম তারপর কড়িদহ, শঙ্খদহ, জোকদহ ও অন্যান্য নদী অতিক্রম করিয়া কালীদহে পৌঁছিল। পদ্মার প্রস্তাবে দুর্গা ধনপতিকে এইখানে কমলে কামিনী ও গজ দেখাইলেন। একই সঙ্গে ভয়ঙ্করী মূর্তি ও মোহিনী মূর্তি শুধু সাধুই দেখিল অন্য কেহ দেখিলনা তবে সাধুর মুখে শুনিল মাত্র। ইহার পর সিংহলের রত্নমালার ঘাটে গিয়া সাধু উপস্থিত হইল।

সিংহলরাজ শালবান্ রত্নমালার ঘাটে বাদ্যাদির শব্দ শুনিয়া বাঘাই নামক কোতোয়ালকে সংবাদ লইতে বলিলেন এবং তাহার মাধ্যমে জানিলেন উজানীর বাণিয়া ধনপতি চন্দন লইতে আসিয়াছে। সাধু রাজার নিকট ভেট লইয়া উপস্থিত হইয়া কথাপ্রসঙ্গে কমলেকামিনী ও হস্তী দেখার কথা বলিল এবং জানাইল সে শালবানকে তাহা দেখাইতেও পারে, না পারিলে তাহার দ্রব্যসম্ভার হরণ করিয়া রাজা তাহাকে বন্দী করিতে পারে। শালবানের ইহা বিশ্বাস না হওয়ায় নাবিকদিগকে ডাকিয়া তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা দেখে নাই শুধু শুনিয়াছে মাত্র এইকথা বলিল। রাজা ধনপতিকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। দুর্গা সাধুর স্বপ্নে দেখা দিয়া জানাইলেন ইহা তাহার ঘট পায়ে ঠেলার শাস্তি। ধনপতি তখন মা বলিয়া অনেক কাকুতি মিনতি করাতে দুর্গা বলিলেন বার বৎসর বন্দী থাকার পর পুত্র আসিয়া তোমাকে উদ্ধার করিবে।

পাছে খুল্লনা বিধবা হয় এই শঙ্কায় পদ্মা দেবীকে কৃপা করিতে বলায় তিনি তাহার পদ্মহস্ত ধনপতির মস্তকে বুলাইয়া অনাহারে বার বৎসর বাঁচার শক্তি সঞ্চার করিয়া দিলেন। শেষে শ্বেতকাকের মূর্তি ধরিয়া উজানীতে পৌঁছিয়া স্বপ্নে খুল্লনাকে সাধুর সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। খুল্লনা জাগিয়া উঠিয়া লহনাকে সঙ্গে লইয়া ভ্রমরার নৌকাঘাটে আসিয়া কাঁদিতে লাগিল

খুল্লনা সকল অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিলে দেবীর নিষেধে বিরত হইল। সপ্তমমাসে খুল্লনার সাধভক্ষণ হইল এবং লহনা দুর্বলাকে দিয়া যত কিছু খুল্লনা খাইতে চাহিল সবই জোগাড় করিয়া দিল। পূর্ণমাসে ভবানী স্মরণ করিয়া খুল্লনা পুত্রসন্তান প্রসব করিল। যথাকালে জাতকর্মাদি সমাপ্তির পর একমাসের কালে পুত্রের নাম রাখা হইল শ্রীমন্ত। ছয়মাসে অন্নপ্রাশন ও পাঁচবৎসরে কর্ণবেধ করা হইল। দুরন্ত শ্রীমন্তের উপদ্রবে প্রতিবেশীরা অস্থির। পণ্ডিত শ্রীহরির নিকট তাহাকে পড়িতে দেওয়া হইল এবং অল্পকালেই সে বিদ্বান্ হইয়া উঠিল। একদিন দুর্গার মায়াবলে শ্রীমন্তের খড়ি হস্তচ্যুত হইয়া মাটিতে পড়িলে সে পণ্ডিতকে উহা উঠাইয়া দিতে বলিল। পণ্ডিত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে 'জারুয়া' বলিয়া গালি দিয়া উঠিলেন এবং তাহার পিতা কে? জিজ্ঞাসা করিলেন। পণ্ডিতের উক্তি শুনিয়া শ্রীমন্ত বাড়ী আসিয়া গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া রহিল। তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেলনা; লহনা বলিল ভাল হইয়াছে - আর তাহাকে দুইবেলা রান্না করিতে হইবেনা। বিমাতার উক্তি ও মাতার ক্রন্দন শুনিয়া শ্রীমন্ত দরজা খুলিল কিন্তু আড়ালে থাকিয়াই মাকে প্রশ্ন করিল যে পণ্ডিত ওকথা কেন বলিল এবং তাহার বাবাই বা কে? আর না বলিলে সে বিষ খাইবে। খুল্লনা বলিল দুর্ভিক্ষে তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। ইহা শুনিয়া শ্রীমন্ত গয়া যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল পিতার উদ্ধারের জন্য। মা বলিল বিদেশের কোথায় বা তোমার পিতা মরিয়াছে সে চিন্তা বাদ দাও। শ্রীমন্ত পুনঃ বলিল পিতার মৃত্যুই যদি হইয়া থাকে তবে তুমি সিন্দুর পর কেন বা বিধবার আচরন তোমার নাই কেন? শেষে খুল্লনা জয়পত্র দেখাইলে শ্রীমন্ত দক্ষিন পাটনে যাইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

খুল্লনা বুকের রক্ত ধারা দিয়া দেবীকে পুজিল। দেবী আবির্ভুত হইয়া স্মরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে খুল্লনা পুত্রের দক্ষিন পাটন যাওয়ার কথা বলিল। দেবী হনুমান ও বিশ্বকর্মাকে দিয়া সপ্তডিঙ্গা গড়াইয়া দিলেন। ভ্রমরার ঘাটে শ্রীমন্ত সপ্তডিঙ্গা দেখিয়া খুশী হইল। নৌকাগুলি সোনার শিকলে ঘাটে বাঁধা ছিল। তখন কর্ণধার দ্বারা বাণিজ্যদ্রব্য নৌকায় তুলিয়া সঙ্গে দাঁড়িমাঝি লইয়া চণ্ডীপূজা করিয়া শ্রীমন্ত নৌকায় উঠিল। প্রতিবেশীরা শঙ্কিত হইল - মাতা অশ্রুপাত করিতে করিতে জয়পত্র ও একটি অঙ্গুরী দিয়া পিতাকে দেখাইতে বলিল - তাহা হইলেই সে চিনিবে শ্রীমন্তকে। শ্রীমন্ত নানা কথায় মাতাকে প্রবোধ দিল ও সাবধান করিয়া দিল। মা নানা উপচারে দেবীর পূজা নৌকাতে করিল। চণ্ডীদেবী শ্বেতমাছির রূপ ধারণ করিয়া খুল্লনার কানের কাছে আসিয়া বলিলেন, 'তোমার পুত্রের সহিত রাজকন্যার বিবাহ দিয়া মর্য্যাদাসহ তাহাকে ফিরাইয়া আনিব'। খুল্লনা বলিল শ্রীমন্ত বাপকে পাইয়া যেন মাকে না ভোলে। শ্রীমন্ত মাতাকে আশ্বস্ত করিয়া নৌকা ছাড়িল। খুল্লনা চণ্ডী ও গঙ্গাকে স্মরণ করিল। শ্রীমন্তের সঙ্গীসাথীরা, দুর্বলা, পাঠশালার পণ্ডিতও ক্রন্দন করিতে থাকিল। শ্রীমন্ত শুভঅশুভ দুইরকম চিহ্নই দেখিতে পাইল। ক্রমে নৌকা অগ্রসর হইয়া চলিতে থাকিল।

একে একে ডিঙ্গা ১২ ভ্রমরা হইতে যাত্রা করিয়া শিবাই নদী, গুপ্তগঙ্গা, ভীমঘাটা, কুমারপুর, বগাইচণ্ডী, কোদালিয়ার ঘাট, হালিশহর, ত্রিবেনী, প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া শ্রীমন্ত গঙ্গাতীরে আসিল এবং গঙ্গা ভাগীরথী পাড়ি দিল। ইন্দ্রানীতে পৌঁছিয়া সাধু পিতার খোঁজ লইল, এবং রন্ধন ভোজনশেষে তথায় রাত্রিযাপন করিল। পরদিন কলিকলা ও ধুরাইচুরাই গাঙ্গ পাড়ি দিল। নদীয়া পৌঁছিয়া সেখানেও পিতার খোঁজ লইল। কিন্তু না পাইয়া হতাশ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে চাহিল। স্বপ্নে দেবী আবির্ভূত হইয়া তাহাকে জয়পত্র পড়িয়া পিতার ঠিকানা দেখিতে বলিলেন। শ্রীমন্ত প্রভাতে জয়পত্র পড়িয়া তাহাতে দক্ষিন-পাটন স্থানের নাম দেখিয়া কাণ্ডারদিগকে নৌকা বাহিতে বলিল। সপ্তগ্রামে আসিয়া দুর্গার মণ্ডপে সাধু চণ্ডীর পূজা করিল। নৌকা ছাড়িয়া ক্রমে গোস্তপাড়া, গঙ্গাসুরেশ্বরী, অম্বুয়ামুলুক প্রভৃতি পিছনে রাখিয়া পদ্মাতে মিলিয়া মগরাময়ালে পৌঁছিল।

দেবী ভাবিলেন এখানে পিতার ন্যায় পুত্রকেও কিছু বিড়ম্বনা দিবেন। তিনি গেলেন ইন্দ্রপুরে এবং ইন্দ্রের নিকট মেঘগণকে চাহিলেন। ইন্দ্র চৌষট্টি রকম মেঘ আনিয়া হাজির করিলেন। দেবী তাহাদের মধ্য হইতে পাঁচজনকে লইয়া বলিয়া দিলেন- মগরাদহে ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ কর। ঝড়ে শ্রীমন্তের সব ডিঙ্গা ডুবিবার উপক্রম হইলে শ্রীমন্ত দেবীর চৌতিশা স্তব আরম্ভ করিল। কিন্তু কোনো ফলোদয় না হওয়ায় শ্রীমন্ত তুলসীর মালা গলায় দিয়া সূর্যদেব, পূর্বপুরুষ ও পিতামাতার উদ্দেশ্যে জলদান করিতে লাগিল। ইহাতেও ঝড় উপশমিত না হওয়ায় শ্রীমন্ত চণ্ডী স্মরণ করিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। চণ্ডীর আশীর্বাদে অগাধ জল হাঁটুজলে পরিনত হইল - দেবী কৈলাস ছাড়িয়া মগরায় আসিয়া শ্রীমন্তকে কোলে তুলিলেন। ঝড় থামিল, নৌকাও চলিতে লাগিল। ক্রমে তাহারা সাপাদহ, কড়িদহ, শঙ্খদহ, কাকড়াদহ, জোকদহ, মশাদহ, হাতিয়াদহ, কুম্ভীরদহ পার হইয়া কালীদহে পৌঁছিল। দেবী পদ্মার সহিত পরামর্শ করিয়া শ্রীমন্তকেও শালবানের হাতে বন্দী করার প্রয়োজনে তাহাকে এই কালিদহে কমলেকামিনী দেখাইবার ব্যবস্থা করিয়া সবই দেখাইলেন; এই সময়ে দেবী নানাভাবে নানা মূর্তিও ধরিলেন। শ্রীমন্ত ভয় পাইল এবং কাণ্ডারকে সকল কথা বলিল। কাণ্ডার ভাবিল কোন দেবতার ছলনা হইবে।

ক্রমে তাহারা কালীদহ ছাড়িয়া ব্রহ্মকুণ্ডে পড়িল, অগ্নিপ্রায় জল দেখিয়া সাধু ভীত হইল। কাণ্ডার তাহাকে আশ্বস্ত করিল। ক্রমে রত্নমালার ঘাটে আসিয়া তাহারা নানা বাদ্য বাজাইতে লাগিল। শব্দ শুনিয়া রাজা শালবান বাঘাই কোতালকে বলিলেন নৌবহর শত্রুর হইলে মারিয়া তাড়াইবে আর মিত্র হইলে লইয়া আসিবে। কোতাল জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিল, তাহারা বানিজ্য করিতে আসিয়াছে, শ্রীমন্ত কোতালকে শত তঙ্কা দিয়া ঘাটে নৌকা বাঁধিল। শ্রীমন্তের রূপে নারীরা বিভ্রান্ত হইয়া তাহার প্রশংসা করিল। শ্রীমন্ত পঞ্চ মানিক, মিষ্ট নারিকেল ও নানাদ্রব্য লইয়া রাজাকে ভেট দিতে চলিল। রাজাজ্ঞা পাইয়া দ্রব্য বিনিময়ের কথা শ্রীমন্ত উত্থাপন করিল।

একপাত্র বলিল নারিকেলে বিষ আছে, সুতরাং শ্রীমন্তকে নিজের উপর নারিকেল পরীক্ষা করিতে হইল। শ্রীমন্ত নানাধরণের কমমূল্যের দ্রব্যের বদলে বেশী মূল্যের দ্রব্য সংগ্রহ করিল। দেবী শালবানকে স্বপ্ন দেখাইলেন, সাধু তোমাকে সকল বিষয়ে ঠকাইতেছে, প্রভাতে উঠিয়া ক্রুদ্ধ রাজা সাধুকে ধরিয়া আনাইয়া তাহার পরিচয় চাহিল, শ্রীমন্ত বলিল আমি জাতিতে গন্ধবণিক, পিতা ধনপতি মাতা খুল্লনা, বাড়ী উজানীনগর, সেখানকার রাজা বিক্রমকেশর। পথের পরিচয়ও একে একে দিয়া শেষে কালিদহের আশ্চর্য্য ঘটনার কথা বলিল। রাজা বলিলেন আমার রাজ্যে কমলই নাই তুমি তবু যদি দেখাইতে পার তবে আমি রাজ্যপাট তোমাকে দিব। ইতঃপূর্ব্বে এক সাধু ঐরূপ কথা বলিয়া তাহা মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ার ফলে বন্দী আছে। শ্রীমন্ত বলিল আমি দেখাইতে না পারিলে আমার ধন লুটিয়া লইয়া দক্ষিণমশানে আমার মস্তকচ্ছেদন করিও। রাজা প্রতিজ্ঞা করিলেন অর্দ্ধেক রাজ্য ও রাজকন্যা পণ। উভয়েই প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিল।

দেবী তখন কালীদহের সমস্ত কমল তুলিয়া লইলেন। রাজা ও শ্রীমন্ত নিজ নিজ লোকজন লইয়া কালিদহে যাত্রা করিল। কালিদহে কেহই কমল না দেখায় শ্রীমন্ত বলিল নৌকায় চাপা পড়িয়াছে। তখন ডুবুরী নামান হইল; ডুবুরী ডুব দিয়া গঙ্গার সাক্ষাৎ পাইলে তিনি বলিলেন উহা মায়াদুর্গার মায়া সৃষ্টি - ডুবুরি তখন তলের মাটি লইয়া উঠিয়া আসিল। বিপদ দেখিয়া শ্রীমন্ত কর্ণধারকে সাক্ষ্য মানিল, কর্ণধার বলিল সে দেখে নাই-শুনিয়াছে মাত্র। তখন রাজা কোটালকে দিয়া শ্রীমন্তকে বন্দী করাইল, ইহা দেখিয়া শ্রীমন্তের মাঝি মাল্লারা ভয়ে জলে ঝাঁপ দিল। রহিল শুধু একা কাণ্ডার। রাজা কোটালকে সাধুর সমস্ত ধন লুটিয়া লইয়া তাহাকে দক্ষিণ মশানে লইয়া গিয়া তাহার মস্তকচ্ছেদন করিতে বলিলেন। রাজা ফিরিয়া গেলেন। শ্রীমন্ত তখন কাণ্ডারকে বলিল সে যেন তাহার মাকে সব সংবাদ জানায়। কাণ্ডার তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে রাজী না হইয়া বলিল - তোমার মৃত্যু রাজার অস্ত্রে হইলে আমি বিষ খাইয়া মরিব। কোটাল শ্রীমন্তসহ মশানে গেল। শ্রীমন্ত কোটালের অনুমতি লইয়া স্নান করিয়া গঙ্গাজল পান করিল যাহাতে মরিলে সে বৈকুণ্ঠে যাইতে পারে। জলে তাহার পলায়ন নিবারণের জন্য লোহার জাল ফেলিয়া চারধারে সৈন্য সামন্ত রাখা হইল। ভবানী স্মরণ করিয়া শ্রীমন্ত জলে নামিয়া স্নান করিয়া সূর্য্য, যমরাজ, প্রপিতামহ, পিতামহ, পিতা, দনাই গুরু, লহনা, খুল্লনা ও দুবুলার উদ্দেশ্যে তর্পনের জল দিল। তারপর মুখে জল দিলে ভয়ে জল মুখের বাহিরে আসিল। কোমরের দড়ি ধরিয়া কোটাল টানিলে শ্রীমন্ত উঠিয়া আসিল এবং মাথার পাগড়ী ঝাড়িতে গেলে মায়ের দেওয়া অষ্ট তণ্ডুল ও দূর্ব্বা মাটিতে পড়িল। তাহা ভক্তিভরে মাথায় ঠেকাইয়া আর একবার ফির জলে নামিতে চাহিল একজন বান্ধবের নামে তর্পন করিতে। জলে নামিয়া শ্রীমন্ত দুর্গার স্তুতি আরম্ভ করিল এবং বলিল দশভুজা দেবী যেন তাহাকে মশানে রক্ষা করেন।

জলে নামিয়া শ্রীমন্ত চৌতিশা স্তব আরম্ভ করিল এবং বলিল পিতার উদ্ধারে ~~আসিয়া~~
আসিয়া আমি বিপন্ন-আমাকে উদ্ধার কর। স্বর্গে দেবীর আসন টলিলে তিনি
পদ্মাকে জিজ্ঞাসা করেন ইহার কারণ কি? পদ্মা বলিলেন মশানে ~~শ্রী~~ শ্রীমন্ত
তাহাকে স্মরণ করিতেছে। তাহাকে রক্ষা না করিলে তাহার নামের মহিমা
নষ্ট হইবে। দেবী খড়্গ ও খর্পর লইয়া প্রস্তুত হইতেই অন্যান্য দেবতারাও
নিজ নিজ অস্ত্র তাহাকে দিলেন। শিবও শূল দিলেন। দানাগণ দেবীর সঙ্গে
চলিল। ভীমবীরকে সারথি করিয়া রাম নাম জপিয়া দেবী রথে আরোহন
করিলেন। দেবী প্রথমে খুল্লনাকে স্বপ্নে পুত্রের বিপদের কথা জানাইয়া তাহার
পূজা করিতে বলিলেন। খুল্লনা পূজা আরম্ভ করিল। দেবী দানাগণসহ মশানে
আসিয়া মায়া করিয়া বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশ ধরিয়া ডালির মধ্যে পানগুয়া ও
নড়ি লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং বেদপাঠ করিয়া কোতালকে আশীর্বাদ ~~করিলেন~~
দিলেন। বৃদ্ধার আগমন কারণ জানিতে চাহিলে দেবী শ্রীমন্তকে দান চাহি-
লেন। কোটাল রাজার কথা অমান্য করিতে অক্ষমতা জানাইলে দেবী বলিলেন,
আমি একাদশীর পর পারণা করিব এবং সে জন্য পাঠা মহিষ চাই। কোটাল
উত্তর করিল তুমি ব্রাহ্মণী নও - যে সব খাদ্য চাহিলে তাহা রাক্ষসী ও ডাইনীর
খাদ্য। দেবী বলিলেন পাঠা মহিষ অনেক খাইয়াও পেট ভরে নাই, এখন
সেনাসহ তোমার রাজাকে খাইব। এই বলিয়া দেবী মুখব্যাদান করিলেন।
বুড়ীর উদরে পাঠা মহিষ, রাক্ষস, পশুপক্ষী, মানুষ প্রভৃতি দেখিয়া কোটাল
ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। কোটালের প্রশ্নের উত্তরে দেবী বলিলেন শ্রীমন্ত তাহার
নাতি - দাসীপুত্র, পিতার সন্ধানে আসিয়াছে - সে দোষ করিয়া থাকিলেও
তাহার প্রাণরক্ষা করিয়া আমাকে দান দাও। এই বলিয়াই দেবী বকুলতলা
হইতে শ্রীমন্তকে কোলে লইলেন। কোটাল তাহাকে ফিরাইয়া দিতে বলিল
এবং না দিলে দেবীকেও সে কাটিবে এরূপ বলিল। বুড়ী শ্রীমন্তকে না ছাড়িয়া
তাহাদের রক্তপান করিতে চাহিলে কোটাল গর্জিয়া উঠিয়া দেবীকে ঠেলিয়া
ফেলিল এবং সৈন্যগণকে আদেশ করিল দেবীর সহিত শ্রীমন্তকে মারিয়া ফেলিতে।
শ্রীমন্ত ভয় পাইলে দেবী তাহাকে অভয় দিলেন। দানাসহ দুর্গা ও সেনাসহ
কোটালের মধ্যে তখন ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। দুর্গা চামুণ্ডা-ভাবেতে
নরমুণ্ড কাটিয়া গলায় পরিলেন ও রক্তপান করিতে থাকিলেন। ভগ্নদূত রাজাকে
সব জানাইলে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া আরও সেনা ও সেনাপতি পাঠাইল। দেখিয়া
শ্রীমন্ত ভীত হইল, দেবী বলিলেন আমি আদ্যোর দেবতা আদি ভবানী কেহই
আমাকে পরাস্ত করিতে পারিবেনা সুতরাং শ্রীমন্তের ভয় নাই। শালবান্
প্রেরিত নূতন সেনাপতি ও সেনারা মশানে আসিলে পুনরায় ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ
হইল। ক্রমে রাজসেনা নিশ্চিহ্ন হইতে লাগিল। দুর্গার মায়ায় শ্রীমন্তের
নৌকার চামরগুলি শকুনি হইয়া হস্তী ঘোড়া সব গিলিতে লাগিল। অবশেষে
শালবান আসিয়া শিবপ্রদত্ত শক্তিশেল দুর্গার দিকে নিক্ষেপ করিলে দুর্গা তাহা
দশহাত দিয়া ধরিয়া ফেলিলেন এবং স্বয়ং দশভুজা মূর্তিধারণ করিয়া ডাকিনী-
যোগিনী সহ যুদ্ধে রক্তের নদী বহাইলেন। রাজসেনার অবশিষ্ট অংশ ভয়েই
প্রাণত্যাগ করিল।

মুণ্ডমালী দেবী চামুণ্ডামূর্ত্তি ধরিয়া নাচিতে ও রক্তপান করিতে লাগিলেন। একটি ব্রাহ্মণ শিশু দেখাইয়া বাঁচিতে চাহিলে দেবী বলিলেন তোমাকে পূজার জন্য রক্ষা করিলাম, তুমি যাইয়া শালবানকে বল তাহার আরও সেনা থাকিলে যেন পাঠাইয়া দেয় কারণ দেবীর উদর এখনও পূর্ণ হয় নাই। রাজা ব্রাহ্মণের মুখে সব শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন মহাপাত্র দামোদর পরামর্শ দিলেন ব্রাহ্মনীর পায়ে পড়ার জন্য। রাজা মশানে যাইয়া দেবীর কাছে ক্ষমা চাহিলেন। দেবী তখন কোথায় তিনি কি নামে থাকেন তাহার পরিচয় দিয়া বলিলেন, আমিই আদ্যা ভবানী - শ্রীমন্তকে রক্ষা করিলাম। সে বাস্তবিক দোষী নয়, আমিই কমল সৃষ্টি করিয়াছিলাম। সেই কমল তোমাকে দেখাইতেছি এই বলিয়া তিনি হনুমানকে আদেশ করিতেই হনুমান কমল আনিয়া দিল। দেবী রাজাকে কমলেকামিনী মূর্ত্তিও দেখাইলে রাজা মোহিত হইলেন।

এবার শ্রীমন্ত প্রতিজ্ঞাপূরণের দাবী করিল। রানী বলিলেন আত্মীয় স্বজন সবই সদ্যমৃত - কাজেই তাহারা না বাঁচা পর্য্যন্ত বিবাহ হইবেনা। শ্রীমন্তের প্রাণত্যাগ সঙ্কল্প দেবী হনুমানকে দিয়া যমপুরী হইতে সব জীব আনাইয়া রাজার পক্ষের সকলকে বাঁচাইয়া তুলিলেন। বাঁচিয়া উঠিয়া তাহারা গর্ব্ব গর্জ্জিতে থাকিলে দেবী তাহাদিগকে ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিলেন। তাহারাও দুর্গাচরণে নত হইল। রাজা দুর্গার পূজা করিয়া শ্রীমন্তের সহিত কন্যা সুশীলার বিবাহ দিলেন। সুশীলা স্বামীকে সপ্তপ্রদক্ষিন করিয়া গলায় মালা দিল। রাজা অর্দ্ধরাজ্যও দান করিলেন এবং সাতখানা নৌকাও ফিরাইয়া দিলেন। কান্ডার বলিল শ্রীমন্ত বন্দীঘর না পাইলে সুখী হইবেনা। রাজা তখন তিলকুশ হাতে লইয়া বন্দীঘরও দান করেন। শ্রীমন্ত বন্দীদের আনার জন্য কোটালকে আদেশ করিল। তাহাদের আনা হইলে শ্রীমন্ত পিতার লক্ষণ কাহারও মধ্যে দেখিলনা। তারপর আনা হইল হাতে পায়ে শিকল দেওয়া বন্দীদের; ইহাদের একজনের মধ্যে পিতার কিছু লক্ষন দেখিতে পাইয়া তাহার শৃঙ্খল মুক্ত করাইয়া ও পরিচ্ছন্ন করাইয়া জিজ্ঞাসাবাদের পর তাহাকে পিতা বলিয়া চিনিল। ভোজনান্তে জয়পত্র দেখাইলে ধনপতি কাঁদিয়া ফেলিল - তাহার গড় উজানীতে কোন বিপদ ঘটিয়াছে। ইহার পর শ্রীমন্ত তাহার আগমনের কারণ, পথের কথা, রাজকন্যা অর্দ্ধরাজ্য ও বন্দীশালা দুর্গার কৃপায় প্রাপ্তির বিবরণ পিতাকে শুনাইল এবং নিজেকে তাহারই পুত্র বলিয়া পরিচয় দিল। ইহার পর রাত্রিতে বিশ্রামের জন্য শ্রীমন্ত সুশীলার গৃহে চলিয়া গেল।

রাত্রিতে শ্রীমন্ত স্বপ্নযোগে দুর্গার মায়ায় দেখিল তাহার মা অনুযোগ দিতেছে - সে পিতার সন্ধানে আসিয়া মাতাকে ভুলিয়াছে, পুন্দর [illegible] যথাসর্বস্ব লুটিয়া লইয়াছে। প্রভাতে শ্রীমন্ত সুশীলাকে স্বপ্নবৃত্তান্ত জানাইয়া কাঁদিতে থাকিলে সুশীলার সকল [illegible] মায়ের কাছে বলিলেন।

নীলারানী বলিলেন তাহার মাকে আনাইয়া দিবেন। শ্রীমন্ত ইহাতে খুশী না হওয়ায় সুশীলা বারমাসিয়া বলিয়া তাহাকে বারমাসের সুখের প্রলোভন দেখাইল। এতেও কিছু না হওয়ায় শ্রীমন্ত সুশীলা, পিতা ও তাহার ধনরত্নসহ দেশে যাত্রা করিল। ফিরিবার পথে মগরাদহে পৌঁছিলে ধনপতি ছয়খানা নৌকা ডোবার কথা জানাইলে সুশীলা সেখানে দেবীর পূজা করিল এবং দেবীর কৃপায় ভরা নৌকা উঠিয়া আসিল। অন্তে সকলে খুল্লনার ঘাটে উপস্থিত হইল।

ধনপতি রাজাকে চন্দন দিতে যাইয়া তৎসহ আরও নানা উপঢৌকন দিলেন। রাজা বিক্রমকেশর পিতাপুত্রের সমৃদ্ধি দেখিয়া আপন কন্যা জয়াকে শ্রীমন্তের সাথে বিবাহ দিতে চাহিলে ধনপতি অস্বীকার করে, ফলে বন্দী হয়। শ্রীমন্ত এই সংবাদে মায়ের অনুমোদন লইয়া জয়াকে বিবাহ করিল এবং ধনরত্নসহ পিতাকে পুনরায় মুক্ত করিয়া বাড়ী ফিরিল।

চাররাজ্যের চারজন (খুল্লনা, শ্রীমন্ত, সুশীলা, জয়া) একত্র হইয়া তখন ভবানী পূজার আয়োজন করিয়া যুগে যুগে আবির্ভূত দেবীর ক্ষমতার কাহিনী শুনিল। ধনপতিও গড়াগড়ি দিয়া দেবীকে প্রনাম করিলে দেবী তাহার গোদ ও চক্ষের হানী দূর করিয়া দিলেন। কিন্তু সুখের দিন দীর্ঘকাল হইলনা, ভবানীর নির্দেশে সুশীলা-জয়া (উর্বশী-দুলুবী), শ্রীমন্ত(মালাধর), ও খুল্লনা (রত্নমালা) চারজনে স্বর্গগমনের উদ্দেশ্যে সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া দেহত্যাগ করিল। তাহাদের শোকে সকলে মুহ্যমান হইল। দেবী তাহাদের জীব লইয়া স্বর্গে যাইতে যমদূত ও যম দেবীকে বাধা দিতে আসিয়া উহারা ভবানীর ভক্ত বলিয়া ছাড়িয়া গেল। ভবানী তাহাদের পূর্বরক্ষিত দেহে জীব সঞ্চার করিয়া ইন্দ্রের নিকট সমর্পন করিলেন। ইন্দ্র তাহাদিগকে পাইয়া আনন্দিত হইল এবং দেবীও তাঁহার কামনা সিদ্ধ করিয়া স্বর্গে গেলেন।

• (কাহিনী সমাপ্ত) •

কাহিনীতে অসঙ্গতি :- মানিকদত্ত রচিত এই কাহিনীর মধ্যে কয়েকটি স্থানে কিছু কিছু অসামঞ্জস্য ও ফাঁক লক্ষ্য করা যায়। যেমন (১) পুষ্পদন্ত বিদ্যাধরের শুক-শারীর জন্মের কারণ দুই জায়গায় দুইরকম পাইতেছি, (২) শ্রীমন্তের শিক্ষকের নামও দুইস্থানে দুইরূপ, (৩) মশানে স্নানান্তে শ্রীমন্তের মস্তকের পাগড়ি হইতে যে অষ্টতন্ডুল ও দূর্বা খুলিয়া পড়িয়াছিল তাহার আগম সম্পর্কে কবি নীরব। (৪) দক্ষিণপাটন যাত্রাকালে শ্রীমন্তের মাতার প্রতি উপদেশ খুব শোভন নয়, (৫) যে চারজনকে লইয়া দেবী কাহিনীর শেষে স্বর্গে গেলেন তাহাদের পূর্বদেহ স্বর্গে রক্ষার কি ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহার কোন বিবরণ নাই কিন্তু কাহিনী শেষে পূর্বরক্ষিত দেহ-প্রসঙ্গের উল্লেখ দেখি। (৬) - কাহিনীর গায়নকাল দুইস্থানে দুইরূপ পাই। প্রথমদিকে আছে সপ্তরাত্রির উল্লেখ এবং সবশেষে আছে অষ্টরাত্রি-সপ্তদিবার উল্লেখ।

মানিকদত্তের কাব্যে চণ্ডী ।

মানিকদত্তের কাব্যটিতে প্রধান চরিত্ররূপে চণ্ডীদেবীই চিত্রিত হইয়াছেন । তাঁহারই ঐকান্তিক অভিপ্রায় ও সেই অভিপ্রায়ের সার্থকতা বা পূর্ণতা প্রাপ্তিতেই কাব্যের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে । তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন নরলোকে অর্থাৎ মর্ত্তে তাঁহার পূজা নাই অথচ শিবের পূজা আছে, এমনকি বাহুড়া অর্থাৎ পদ্মারও পূজা প্রচলিত । তাঁহার জ্যোতিষী পদ্মা; পরামর্শ দাতা কখনও নারদ কখনও পদ্মা । মর্ত্তে তাঁহার পূজা xx ও ব্রতের মাহাত্ম্য যাহাতে আটদিন ধরিয়া লোকে গানের মাধ্যমে শুনিতে পায় সেই লক্ষ্যেই অতঃপর তাঁহার চিন্তা ও চেষ্টা কেন্দ্রীভূত । উপায় অনুগ্রহ ও নিগ্রহের ফল প্রদর্শন করা — তাহা হইলেই দুঃখের সংসারের অধিবাসী মানুষকুল তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে। প্রথমতঃ তাঁহার অনুগ্রহে দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি ও সুখলাভের অব্যর্থতা দ্বিতীয়তঃ তাঁহার ভয়ে তাহাকে অবহেলা করার শাস্তিরও অনিবার্য্যতায় ।

এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য দেবী মনুষ্যকুলের উপর আস্থা রাখিতে পারেন নাই, অথচ মনুষ্যকুলের হৃদয়ে তাঁহার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির ফলে অনুগ্রহ নিগ্রহের কথা চিরজাগরূক থাকুক ইহাই তাঁহার কাম্য । সেইজন্য প্রয়োজন হইয়াছে দেবলোকবাসীর জীবাত্মা আনিয়া মর্ত্তে তাহাকে জন্ম দিয়া তাহারই জীবনে স্বীয় xxx সন্তোষ ও বিরাগের লীলা দেখানো । এমনতর চেষ্টা একবার করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই, সেইজন্য একবার ব্যাধকুল এবং আরবার বণিককুলকে লইয়া তাঁহার লীলার বিস্তার করিতে হইয়াছে যাহাতে তাহাদের মর্ত্ত্যজীবন কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'গীতপুঁথি' চার.চার. দিনের ও রাত্রির ব্যাপকতা পায় এবং তাহা শ্রবণের ফলে মনুষ্যকুল ভয়ে ও ভরসায় তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিয়া রাখে ।

মানিকদত্ত xxxxxxxxক অঙ্কিত চণ্ডীদেবী একথা বেশ ভালভাবেই জানেন যে 'মুনিয়ে' তাঁহার মাহাত্ম্যজ্ঞাপক সুবিখ্যাত চণ্ডীগ্রন্থ পূর্ব্বেই রচনা করিয়া রাখিয়াছেন। যথা :-

দুর্গা বোলে ইন্দ্র শুনহ বচন ।
মুণি রচিল চণ্ডী বিখ্যাত ভুবন ।।
গীতমঙ্গলের পুঁথি পাইব কেমনে । (পৃ. ২১)

তথাপি তাহা বোধহয় তাঁহার নিকট পর্য্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয় নাই; কারণ সে মাহাত্ম্য মাত্র পণ্ডিতেরাই বুঝে;

সাধারণ লোকের মনকে আনন্দের মাধ্যমে আকর্ষণ করিয়া তাহাতে স্থিরপদ লাভ করাই এখন তাঁহার কাম্য। এই কামনা সফল করার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে ইন্দ্রের নিকট হইতে 'গীতপুঁথি' সংগ্রহ করিতে হইয়াছে এবং মানিকদত্ত নামক এক 'কানাখোড়া' এক মর্ত্যবাসীর প্রতি পূর্বেই অনুগ্রহ প্রদর্শনে তাহার অঙ্গদোষ দূর করিয়া তাহাকে দিয়াই গানের মাধ্যমে সাধারণ্যের একান্ত আস্বাদ্য করিয়া অষ্টমঙ্গলা গানের পালা গাওয়াইতে হইয়াছে।

মার্কণ্ডেয় রচিত সপ্তশতী চণ্ডীর তিনটি 'চরিত্রে' যত যত দৈত্য চণ্ডীর হাতে নিহত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, মানিকদত্তের চণ্ডী তাহাদের অনেককেই প্রথমে নিহত করিয়া দেবলোকে তাঁহার পূজার ব্যবস্থা করিয়াও একটি দৈত্যকে বাকী রাখিয়াছিলেন - এই দৈত্য ধূম্রলোচন। মর্ত্যলোকে পূজাপ্রচারের প্রথম বিঘ্ন এই ধূম্রলোচনকে নিহত করিয়া দেবীকে মর্ত্যে আসার পথ পরিষ্কার করিয়া লইতে হইয়াছিল।

এই দেবী আর কেহ নহেন - ইনি হিমালয় ও মেনকার দুহিতা গৌরী। কিন্তু গৌরীরও অতীত ইতিহাস কিছু আছে। গৌরী রূপটি হইল দেবীর ৭ম জন্মের। প্রথমজন্মে এই দেবীই ধর্মনিরঞ্জনের 'হাস্বী'তে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ধর্মমঙ্গল-শূন্যপুরাণের আদ্যাদেবীর সহিত চণ্ডীর একাত্মতাই মানিকদত্ত প্রদর্শন করিয়াছেন।

যে চরিত্রগুলির মাধ্যমে তাঁহার মহিমা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছে তাহাদের জীবনের গতিপথে এই দেবীকে 'ক্ষণে তুষ্টং ক্ষণে রুষ্টং' মনোভঙ্গী অবলম্বনে নানারূপে আবির্ভূত হইতে দেখি। তিনি কখনও মাছি, কখনও শ্বেতকাক, কখনও কোকিল, কখনও পশু, কখনও সরীসৃপ, কখনও বা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী আবার কখনও বা পাত্রপাত্রীদের রূপও পরিগ্রহ করিয়াছেন। কখনও বা তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন বটে - কিন্তু তাঁহার রূপের কোন পরিচয় মানিকদত্ত লিপিবদ্ধ করেন নাই। কবি এই দেবীকে বিভিন্ন নামে নামাঙ্কিত করিয়াছেন যেমন - আদ্যাভবানী, নারায়ণী, ভগবতী, দুর্গা, অভয়া এবং মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি। কখনও তাহাকে কালীমূর্তিতে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে— এই সময়ে তিনি রক্তলোলুপা, মাংসাশিনী দিগম্বরী এবং যুদ্ধবিদ্যাপারদর্শিনী। আত্মপরিচয় দানকালে তাঁহাকে অসুরদলনী দশভূজা বলিয়াই মনে হয়। মর্ত্যবাসী মানবের সংস্পর্শে আসার সময় হইতে মাঝে মাঝে কবি এই দশভূজারই নাম করিয়াছেন মঙ্গলচণ্ডীপদে। মর্ত্যে কলিঙ্গরাজ সুরথ কর্তৃক দেবীর যে প্রথম পূজা তাহাও মঙ্গলচণ্ডীরই পূজা, যদিও পূজার পূর্বে সুরথের স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া তিনি নিজের পরিচয় দিয়াছেন দশভূজা বলিয়া। কলিঙ্গের প্রজাদের দিয়া যে পূজা করাইতে রাজাকে আদেশ দেন সে পূজাও মঙ্গলচণ্ডীরই ঘটবারি পূজা।

কবি মানিকদত্ত স্বপ্নে যে মূর্ত্তিটি দেখিয়াছিলেন তাহা কবি প্রথমদিকে অপ্রকাশিত রাখিলেও সুরথরাজার বন্ধনে পড়িয়া সেই মূর্ত্তির পরিচয় দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহার বিবরণে দেখি 'তিনি সিংহের পৃষ্ঠে পা দিয়া বৃষে পা হেলাইয়া, পৃষ্ঠে সুবর্ণ ঝাপানি, পায়ে নূপুর, মাথায় মালতীর মালা ও ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন।' আবার দ্বিতীয়বার যখন রুষ্ট হইয়া সুরথের স্বপ্নে দেখা দেন তখন তাঁহার মূর্ত্তি ভয়ঙ্করী-বিকটদশনা, দৈত্যদানা-পরিবৃতা, বামহস্তে শেলধারিণী, তাঁহার দক্ষিণহস্তে কর্ত্তরিকা। পুনঃ সুরথের কাতর প্রার্থনায় যখন তাঁহার আবির্ভাব তখন তিনি ত্রিনয়ণী, দশভুজা ও সিংহবাহিনী।

অপস্যারত ইন্দ্রের কাতর অনুনয়ে যখন দেবী দেখা দেন তখনও তিনি ত্রিনয়ণী, দশভুজা ও সিংহবাহিনী, ব্যাঘ্রের পায়ে তাহার পা হেলান এবং তিনি শেলের আঘাতে অসুরহননে রত। আবার স্বামী শিবের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি রাগ করিয়া 'নাইহরে' অগ্রসর হন। রুষ্টা দেবী শিবের উপর 'চক্রবাণ' ছাড়িতেও দ্বিধা করেন নাই বা শিবের মস্তকে চাটিরূপে হুল ফুটাইতেও তাঁহার আপত্তি জাগে নাই। আপন কার্য্যোদ্ধারের জন্য ঘোরতর মিথ্যার আশ্রয় লইতে এবং যৌবনের লাবণ্য দেখাইয়া শিবের লালসা উদ্রেক করিতেও তাহার বাধে নাই। মাংস-বিক্রয়ে বহির্গত ফুল্লরার সম্মুখে ছলনাময়ী দেবীর আবির্ভাব বৃদ্ধা-~~[illegible]~~ ব্রাহ্মণীর রূপ পরিগ্রহ করিয়া। কালকেতুর গৃহে তাঁহার উপস্থিতি ঘটে নবযৌবনসম্পন্না নারীরূপে। তারপর কালকেতু যে রূপটি দেখে তাহাতে তিনি দিগম্বারূঢ়া, বিকটদশনা ত্রিনয়নী, লোলজিহ্বা, ঘোরমুখবিশিষ্টা জটিনী মুণ্ডমালিনী; তাঁহার মাথার কুন্তল জঘন পর্য্যন্ত বিলম্বিত, তিনি পতির উপর নৃত্যপরা, নরমুণ্ডজড়িত তাহার হস্তপদ ও মধ্যদেশ, তিনি সমুদ্রোদরী, আর সেই উদরে দেখা গেল সমস্ত দেবতাগণকে। এটি দেবীর প্রকৃতরূপ বলিয়া কথিত। পূজক-সাধকের বিশিষ্ট ধ্যানকল্পনায় শক্তির বিভিন্ন প্রকাশের রূপায়নে যে মূল্যই আরোপিত হউক না কেন কাহিনীকারের কাছে ঐ পার্থক্যের সুর বিশেষ-মূল্য নাই।*

বনে পক্ষবিদ্যাধরীর উপদেশে পূজারতা খুল্লনাকে যে মূর্ত্তি তিনি দেখান তাহা দশভুজা। তখন তাঁহার বামপা মহিষের পৃষ্ঠে; দক্ষিণচরণ সিংহপৃষ্ঠে, বামকরে মহিষাসুরের চুলধরা, দক্ষিণকরে মহিষাসুরের বুকে শূল আরোপকরা ও তাঁহার দুইপাশে কার্ত্তিক-গণেশ ও লক্ষ্মী সরস্বতী, বৃষারোহী শিব তাঁহার মস্তকোপরি। ধনপতির বাণিজ্য যাত্রাকালে খুল্লনাকর্ত্তৃক পূজিতা দেবীর আবির্ভাবও দশভুজারূপে এবং তাঁহার কণ্ঠস্বর ছিল মানুষী। ধনপতির দৃষ্টিতে এই দেবী শুধু মায়াকারিনী অর্থাৎ কতকটা ঐন্দ্রজালিকের মত- সুতরাং পূজার যোগ্য নহেন।

---

* 'শেখ-শুভোদয়া' গ্রন্থের দশম-পরিচ্ছেদের শেষাংশে চণ্ডিকা ও কালিকা নামে একই দেবী উল্লিখিত।

এই দেবীই দুই দুইবার ষোড়শী মূর্তিতে কমলেকামিনী হইয়া গজ গিলিতেছিলেন। ইহাও যে মায়িকসৃষ্টি তাহার প্রমাণ বণিকেরা এই মূর্তি দেখিলেও নৌকার মাঝিমাল্লারা দেখিতে পায় নাই। সেবিকার পুত্র শ্রীমন্তের রক্ষা বিধানে দক্ষিণমশানে যাত্রাকালে বিভিন্ন দেবতা তাঁহাকে নানাঅস্ত্র দান করেন। মশানে বিপক্ষীয় কোটালের নিকট তাহার একাদশীর পারণার জন্য তিনি চাহিলেন লক্ষ ছাগ মেষ ও মহিষের 'পাড়া'। মানুষও তাঁহার খাদ্য। তিনি মুখব্যাদান করিতেই তাঁহার মুখমধ্যে দেখা যায় রাক্ষস, মানুষ, পশুপক্ষী ও মানুষের মুণ্ড।

মশানযুদ্ধে তিনি যে মূর্তি শেষে ধারণ করেন তাহার নাম চামুণ্ডা। তখন তাঁহার ডান হাতে খাড়া, বামহাতে খাপড়, জিহ্বাটি লেলিহান -গলায় নরমুণ্ডমালা। মুখ মেলিয়া তিনি অনবরত নরমুণ্ড নিগরণোদ্যতা। এই যুদ্ধেই কখনও বা তিনি দশভুজা। তাঁহার এমনই মায়া যে শালবানের সৈন্যেরা নিজেদের অস্ত্রে নিজেরাই কাটা পড়ে। খাপড় পাতিয়া রক্ত ধরিয়া তাহা পান করিতেও তাঁহার তৃষ্ণা মিটেনা। চামুণ্ডার বেশে রথ, রথী, হস্তী ঘোড়া সবই নিগরণে তিনি পটীয়সী। এই মশানেই যে সক্রিয় মূর্তিটির বিবরণ মানিকদত্ত দিয়াছেন তাহা উদ্ধৃতিযোগ্য এবং তাহা এই :-

ধা: ভয়ঙ্করী বেশে পার্বতী।
হুঙ্কারি সিংহনাদপুরি
ধুমু ২ ধুমু নাচন্তি ।।
চামুণ্ডার মূর্তিধরি পার্বতী ভয়ঙ্করী
অট্ট ২ অট্ট হাসন্তি ।
খাপর ভরি ২ পিএ মাহেশ্বরী
ঘোট ২ ঘোটন্তি ।।
রক্তবীজ তনু বদনে নাক্ষনু
চুষ ২ চুষন্তি ।
ত্রৈরি করে ধরি খাপর ভরি ২
চক ২ চক চিবান্তি ।।
দানাগণ সাথ ত্রৈরি কৈল পাত
খুন্যা ২ ফুন্যা ২ নাচন্তি।
ভবানী সঙ্গে জোগিনী রঙ্গে
খর ২ খর খরন্তি ।।
অভয়াচরণে জয় কবি মানিকদত্তে গায়
দেবের চরণে পরিহারন্তি ।
আমি নর কিঙ্কর কি বলিতে জানি মা
সকল দুর্গার অবতারন্তি ।। পৃ.-৬০১

গায়ত্রীর ত্রিসন্ধ্যার যে ধ্যানগুলি চলিত তাহাও যে এই দেবীরই রূপের বর্ণনা তাহারও আভাষ মানিকদত্ত দিয়াছেন । যথা :-

প্রভাত সময় আমি সর্ব্বমঙ্গলা ।
ব্রহ্মমন্ত্র জপি আমি হস্তে করি মালা ।।
দ্বিতীয় প্রহরে রূপ নানা রূপ ধরে ।
ত্রিতীয় প্রহরে আগু শিব পূজিবারে ।।
চতুর্থ প্রহরে আমি অতি বৃদ্ধকলা ।
রুধির করিএ পান গলে মুণ্ডমালা ।। পৃঃ-৩১৮

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর রক্তবীজবধের সময় আবির্ভূত যে সহায়ক মূর্ত্তি সমূহ তাহাও অনেকটা এইরূপ :-

হংসযুক্তবিমানাগ্রে সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুঃ ।
আয়াতা ব্রহ্মণঃ শক্তির্ব্রহ্মাণী আভিধীয়তে ।।১৫
মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া ত্রিশূলবরধারিণী ।
মহাহিবলয়া প্রাপ্তা চন্দ্ররেখাবিভূষণা ।। ১৬
কৌমারী শক্তিহস্তা চ ময়ূরবরবাহনা ।
যোদ্ধুমভ্যাযযৌ দৈত্যানম্বিকা গুহরূপিণী ।। ১৭
তথৈব বৈষ্ণবী শক্তির্গরুড়োপরি সংস্থিতা ।
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গখড়্গহস্তাভ্যুপাযযৌ ।। ১৮ (৮ম অধ্যায়)

কাব্যমধ্যে এই দেবীর সর্ব্বশেষ উপস্থিতি ঘটিয়াছে খুল্লনা, শ্রীমন্ত, জয়া ও সুশীলাকে লইয়া স্বর্গগমন কালে চতুর্ভুজারূপে । এই চতুর্ভুজার আর কোন বিবরণ মানিকদত্ত দেন নাই । চণ্ডীর যে প্রস্তরখোদিত গোধিকা চিহ্নিত চতুর্ভুজা মূর্ত্তি ২।১টি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা কি এই কাব্যের দুইটি কাহিনীর দ্যোতক? কিন্তু মনে হয় মাহাত্ম্য খ্যাপনের কালে মানিকদত্তের দৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশীবার প্রতিভাত হইয়াছে - দশভুজা মূর্ত্তিটি - যে মূর্ত্তি বাঙ্গালী গৃহে আজও পর্য্যন্ত বহুধা প্রচলিত রহিয়াছে এবং যাহার সহিত মার্কণ্ডেয় চণ্ডী ও তাহার আঙ্গিক পাঠ প্রায় অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল তাহা হইতে ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠে যে মানিকদত্তের চণ্ডী মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত সপ্তশতী চণ্ডী অংশদ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত, শুধু তাহাই নহে - বলিতে ইচ্ছা হয় চণ্ডীমঙ্গলগীত যে দুইটি কাহিনীকে আশ্রয় করিয়া আছে সেই দুই কাহিনী নির্ম্মাণের মূলেও মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর প্রভাব থাকা সম্ভব* তা সে কাহিনী যাহারই রচনা হউক ।

- -

* শুম্ভনিশুম্ভবধ - দ্বাদশ অধ্যায়ে দেবীর উক্তি :-

অরণ্যে প্রান্তরে বাপি দাবাগ্নিপরিবারিতঃ ।
দস্যুভির্বা বৃতঃ শূন্যে গৃহীতো বাপি শত্রুভিঃ ।। ২৬

এক্ষেত্রে আখেটিক খণ্ডের সপক্ষে আমরা বলিতে পারি - মানিকদত্তের চণ্ডী যে নিজের পূজার জন্যই চক্রান্ত করিয়া শিবকর্তৃক মর্তে কালকেতুর জন্ম ঘটাইয়াছিলেন তাহা কাব্য মধ্যে সুস্পষ্ট। উদাহরণস্বরূপ শিবের প্রতি দেবীর উক্তিটি লক্ষণীয় :-

নীলাম্বরে শাপ দিঞা জন্মাহ ব্যাধঘরে ।
নীলাম্বরের পূজা আমি লব মর্ত্যপুরে ।। পৃ. - ৮০

মুকুন্দরামে আমরা বলিতে পারি কালকেতু কর্তৃক দেবীর পূজা লওয়া গৌণ, সেখানে মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছে কেতুকে পশুবধ হইতে নিবৃত্ত করার জন্য ধনদান কিন্তু মানিকদত্তে দেখি কেতুর নিকট হইতে দেবীর পূজা প্রাপ্তিই মুখ্য উদ্দেশ্য, শুধুমাত্র পশুবধ হইতে কেতুকে নিবৃত্ত করার জন্য ধনদান নহে। বরঞ্চ ধনদানের পর কালকেতুকে গুজরাটের রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া দেবীর নিজপূজাতেই কেতুকে অধিকতর আকৃষ্ট করা বা বাধ্য করাই যেন দেবীর প্রধানতর লক্ষ্য। এই প্রসঙ্গে কাব্য মধ্য হইতে নিম্নে প্রদত্ত দুইটি উদাহরণই আশা করি যথেষ্ট-

যেমন :- ১) খাও খরচ কর বৈসাহ নগরে ।
আমার পূজা করিহ বাছা শনিমঙ্গলবারে ।। পৃ. -৯৮

২) ধন ভাঙ্গাইও বাছা পুরাইদত্তের ঘরে ।
বলি দিয়া করিহ পূজা শনিমঙ্গলবারে ।।
তোমার কুড়িয়াতে আমার পদভর ।
ইহার উপরে বান্দিহ আমার পূজার ঘর ।। পৃ. -৯৯

কালকেতু অংশে দেবীর বিকটদশনা কালিকামূর্তি তথা চণ্ডীর অন্যান্য পরিচয় পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। আর বণিকখণ্ডে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর প্রভাব যে অনস্বীকার্য সেকথা বলাই বাহুল্য এবং তাহা সর্বগুণী-জনবিদিত, তাই সে প্রসঙ্গে আর নূতন আলোচনা এক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়। তাছাড়া আমরা আমাদের প্রবন্ধগুলির মধ্যে বিভিন্নভাবে উভয়কাহিনীর কথাই বিশেষভাবে বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। সর্বশেষে আমরা একথা বলিতে পারি যে - মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর ন্যায় মানিকদত্তের কাব্য উভয়ত্রই রাজা ও বৈশ্য কা আশ্রিত। আখেটিক খণ্ডে দেখি রাজা সুরথকে ও দেবী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজা হিসাবে কালকেতুকে এবং বণিকখণ্ডে বৈশ্য ধনপতি, শ্রীমন্ত ও তৎপরিবারবর্গ

সিংহব্যাঘ্রানুযাতো বা বনে বা বনহস্তিভিঃ ।
রাজ্ঞা ক্রুদ্ধেন চাজ্ঞপ্তো বধ্যো বন্ধগতোঽপি বা ।। ২৭
আঘূর্ণিতো বা বাতেন স্থিতঃ পোতে মহার্ণবে ।
পতৎসু চাপি শস্ত্রেষু সংগ্রামে ভৃশদারু ।। ২৮
সর্ববাধাসু ঘোরাসু বেদনাভ্যর্দি
স্মরণ্ মমৈতচ্চরিতং নরো মুচ্যেত সঙ্ক ।
মম প্রভাবাৎ সিংহাদ্যা দস্যবো বৈরি ২৯
দূরাদেব পলায়ন্তে স্মরতশ্চরিতং মম

কাব্যে ঐতিহাসিক ও সামাজিক চিত্র ।

কবি মানিকদত্ত তাহার কাব্যের মধ্যে ব্যাসরচিত পুরাণ[১], বাল্মীকিরচিত[২] রামায়ন এবং 'মুনিয়ে'[৩] রচিত চণ্ডীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন । রামায়ণকে কবি ইতিহাস[৪] বলিয়াই জানিতেন এবং কৃত্তিবাসকে[৫]ও রামায়ণ রচনাকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । গৌড়দেশ যে যবন অধিকারে চলিয়া গিয়াছে তাহারও উল্লেখ মানিকদত্তে পাইতেছি । মুসলমান দরবারের কুর্নিশ করার যে নিয়ম প্রচলিত ছিল তাহারই প্রতিরূপ দেখা যায় শারীশুয়া যখন উজানীরাজ বিক্রমকেশরকে প্রণতি জানায় -' শারীশুয়ার প্রনাম চারবারে '। মসজিদের[৬] উল্লেখও মানিকদত্ত করিয়াছেন ।

কলিকালকে মানিকদত্ত চৈতন্যভাগবতের কবির ন্যায় ধন্য ধন্য বলেন নাই - বলিয়াছেন ' ঘোর কলিকাল '। শ্রীমন্ত তাহার গুরুগৃহে যে সকল পাঠ গ্রহণ করিয়াছিল তাহার মধ্যে আছে পিঙ্গল, সুবন্ত ও অভিধান প্রভৃতি । ইহা বাস্তবিক পক্ষে সংস্কৃত টোলে পাঠ্যভুক্ত থাকা স্বাভাবিক ।

শ্রীমন্ত পিতার সন্ধানে যাত্রাপথে ইন্দ্রানী ছাড়ার পর নদীয়াতে উপস্থিত হয় । সেখানে অহর্নিশি হরিসঙ্কীর্তন প্রচলিত । তাহার পরেই উক্ত হইয়াছে - ধন্য ধন্য পুন্য করে শচী ঠাকুরানী ।
যাহার পতেক নাম পুরাণে বাখানী ।। পৃ.- ২৫৮

অপর অংশে উক্ত হইয়াছে - অপূর্ব দেখিলাম দেশ বড় পুন্যবান্ ।
গৌরচন্দ্র জানিলাম সাক্ষাৎ ভগবান্ ।। পৃ.-২৫৮

এই উক্তি দুইটি আমাদের ধারনায় পরবর্তী কালের সংযোজন । কারণ শ্রীমন্তের কালের অনির্দেশ্যতা বাদেও মানিকদত্তের কালেও যদি শ্রীচৈতন্য ভগবান্ বলিয়া পরিচিত হইয়া গিয়া থাকেন তবে তাঁহারকথা ধনপতির বাণিজ্য - যাত্রায়ই উল্লিখিত হইত - এত গুরুত্বপূর্ন স্থান তৎকালে গঙ্গার ধারে আর কিছুই ছিলনা । তেমন অবস্থায় ইহাই স্বাভাবিক হইত যে মানিকদত্ত ধনপতির যাত্রার সময়ই ইহার উল্লেখ করিতেন । তাছাড়া শচীঠাকুরানী ধন্য ধন্য নিশ্চয়ই, কিন্ত তাহার 'পতেক' নাম অতবড় ঘনিষ্ট ব্যক্তি যে নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার শিষ্য চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবন দাসের জানা নাই । পুরাণে 'বাখানী' তো হইতেই পারেনা । কারণ কোন পুরাণেই শ্রীচৈতন্যের মাতা শচীঠাকুরানীর উল্লেখ নাই । আসল ব্যাপারটা এইরূপ হওয়া সম্ভব যে চৈতন্যভাগবত রচনার পর (১৫৪২ও) সেই গ্রন্থখানি বৈষ্ণবগণের মধ্যে পুরাণের মর্য্যাদা পায় এবং কোন চৈতন্যভক্তগায়ক অতিভক্তির বশে এই অংশটুকু জুড়িয়া দিয়াছেন । এমনতর ঘটনা শুধু আমাদের পান্ডুলিপিতেই নয়. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পান্ডুলিপিতে আরও ব্যাপকভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে ।

---

১. পৃ.- ৬, ২৩৯, ২৭৮ । ২. পৃ.-৮৭, ২১৮ । ৩. পৃ.- ২৯ ।
৪. পৃ.- ১৯৪ । ৫. পৃ.- ৭৩ । ৬. পৃ.- ২৩৪ ।

আমাদের একথা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে আমরা মানিকদত্তকে শ্রীচৈতন্যের পূর্ববর্তী বলিতে আগ্রহী, - আমাদের গভীর বিশ্বাস মানিকদত্ত শক্তি-সম্পর্কিত কাব্য রচনা করিতে যাইয়া এতটা উদারতা দেখান নাই যাহার ফলে তাহার কাব্যটি কোন সমন্বয়ী মনোভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে পারে। যিনি সুপাত্র রুধির এমনকি হাতের আঙ্গুল পায়ের মাংস কাটিয়া পূজা দেওয়াইয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করাইতেছেন, পূজার আয়োজন হইলেই যেখানে পাঁঠা মহিষ শত শত বলি দেওয়ার কথা বলিতেছেন তিনি শ্রীচৈতন্যমতবাদের দ্বারা এতটুকুও প্রভাবিত হইতে পারেন না বিশেষতঃ শক্তি-সম্পর্কিত কাব্য লিখিতে যাইয়া।

মানিকদত্তের কাব্যমধ্যে জনসমাজের নানাশ্রেণীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়। এইগুলির মধ্যে কতক জন্মভিত্তিক কতক কর্ম্মভিত্তিক কতক জন্ম ও কর্ম্মউভয় ভিত্তিক।

জন্মভিত্তিক - কোচ, ব্রাহ্মণ, দোসাউদ, ডোম, ব্যাধ, যবন, চাঁই, কেওট, হাড়ি, কাড়ি, পাঠান, তৈলঙ্গ, রোহিলা উড়িয়া, খোঁজা, কায়স্থ, বৈদ্য, কৈবর্ত্ত, গুড়ি, পরি, কুড়ি, বারুই, তিওর, চাঁড়াল, বাঙ্গালী।

বৃত্তি বা কর্ম্মভিত্তিক - তেলী, লবণিয়া, গোপ, বাণিয়া, আহীর, সূত্রধর, আম্বুলিয়া, করাতী, নাটুয়া, ভাট, পানী, বায়েন, জোলা, নাপিত, গুণী (গায়ক), যোগী, চাষা, সন্ন্যাসী, বৈদ্য, বেরুনিয়া, ভাণ্ডারিয়া, গোয়ালা, মালী, কুমার, কামার, জালিয়া, তাঁতি, কৃষাণ, মুসলমান, মীর, কাজী, মোল্লা, সেক, ফকির, শক্কবেচা, মোদক, হালুই, মাছুয়া, ঢালী, বন্দুকী, লস্কর, পাইক, মারিচা, ধনুকী, মিরাধর, ভারী, কারিগর, বাদিয়া, দাই, কাহার, পাচতি।

ইহা হইতে বুঝা যায় হিন্দু সমাজের ~~xxxx~~ বিভিন্ন শ্রেনী, মুসলমান সমাজের কতকগুলি শ্রেনী এবং ইহা বাদেও উপজাতীয় কয়েকটি শ্রেনী বাংলা দেশের জনসমাজে সুপরিচিত ছিল। খুল্লনার পরীক্ষা দেওয়ার মূলেও আসিয়াছে অনুদার ও পরছিদ্রসন্ধানী মধ্যযুগোচিত মনোভাব। স্থানের ~~xxxx~~ নামকে ভিত্তি করিয়া যে জাতিগুলির নাম করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে আছে বাঙ্গালী, উড়িয়া, তৈলঙ্গ ও রোহিলা। ইহাদের মধ্যে তৈলঙ্গাদের আগমন কিছুটা সংশয় উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য তথা যুদ্ধবিদ্যায় অংশগ্রহন করিয়া তেলেঙ্গানার অধিবাসীদের উড়িষ্যার পথে বাংলায় আসা অসম্ভব ব্যাপার নহে। তা ছাড়া উড়িষ্যার রাজা অনন্তভীমদেবের সময় হইতে (১২০২ খৃঃ) পুরুষোত্তম দেব পর্যন্ত (১৫০৪) তেলেঙ্গানার বহু অংশই তাহাদের রাজ্যভুক্ত ছিল - কেশরী বংশীয় অন্ততঃ কেশরী উপাধীধারী ওড়িয়া রাজারা ইহাদের পূর্ব্বে দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া ছিলেন।

তাহাদের মধ্যে দলবিশেষ, যাহাদিগকে মানিকদত্ত 'তৈলঙ্গা রহিলা বৈসে কেশরীর সন্তান' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা জন্য বাংলা দেশের কোন রাজার অধীনে বেতনভুক হইয়া থাকা তাহাদের ক্ষেত্রে কিছুই অসম্ভব নয়। সেই উপলক্ষেই হয়তো মানিকদত্ত তাহাদিগকে জানিতেন। রোহিলারা রোহিলখণ্ডের অধিবাসী। ঐ অঞ্চলে বসবাসকারী মুসলমানদের সৈনিকরূপে বাংলায় আগমন অসম্ভব নহে। দিল্লীর নিকটবর্তী এই অঞ্চলের অধিবাসীদের রাজনৈতিক প্রাধান্য পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই দেখা যায়। বাংলা দেশে মুসলমান রাজত্বকালে কোন সময়ে ইহাদের আগমন অসম্ভব নহে অন্ততঃ বেতনভুক্ সৈন্যরূপে। অবশ্য এ বিষয়ে এই অংশের নূতনতর কোন পুঁথি না পাওয়া পর্যন্ত মূলপাঠে কি ছিল তাহার সংশয় ঘোচেনা। ইহা ছাড়া আছে অন্য একটি ঐতিহাসিক কাহিনী, এই কাহিনী অনুসারে উড়িষ্যার রাজা নরসিংহ(১ম)দেবের জামাতা হুগলী জেলার মাদারণে একটি করদ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ১২৫৩ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে। সুতরাং এই রাজ্যে তেলেঙ্গা সৈন্যের আগমন বিচিত্র নয় বরং সম্ভবপর।

বৃহদ্ধর্মপুরাণে যে সকল জাতির কথা উল্লিখিত আছে তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিই মানিকদত্ত উল্লেখ করিয়াছেন তাহার রচিত কাব্যমধ্যে নানা প্রসঙ্গে, ইহাদের মধ্যে কায়স্থ, বৈদ্য, গন্ধবণিক, কুম্ভকার, তন্তুবায়, কর্মকার, মাগধ, দাস(চাষী), গোপ, নাপিত, মোদক, বারুজীবি, সূত(ভাট), মালাকর, তাম্বুলী, তৈলিক, সূত্রধর(ছুতা), আভীর, ধীবর, তৈলকারক, নট (নাটুয়া), জালিকা, দোলাবাহী (কাহার), যবন এইগুলি উভয়গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে। মানিকদত্ত এমন কয়েকটি জাতির নাম করিয়াছেন, বোধহয় তাহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে, যাহার নাম বৃহদ্ধর্মপুরাণে পাওয়া যাইতেছেনা। অথচ তাহারা যে বাংলার অধিবাসী সে সম্পর্কে কাহারও বোধ হয় সংশয় নাই। যেমন- ডোম, কোচ, চাঁই, কেওট, হাড়ি, কাড়ি, গুড়ি, পরি, কুড়ি, তিওড়, চাড়াল, বাগ্দী, পক্ষবেচা। সমগ্র বাংলায় না হইলেও মালদহে-পশ্চিম দিনাজপুরে ইহাদের অনেকগুলিই সরকারী রিপোর্টে আজও মিলিতেছে এবং তাহারা যে বাহির হইতে আসিয়াছে এমন প্রমাণও পাওয়া যায় নাই। সুতরাং বৃহদ্ধর্মপুরাণ উল্লিখিত জাতিগুলি সেই যুগের(ত্রয়োদশ শতাব্দী ?) পরিপ্রেক্ষিতেও পরিপূর্ণ বলিয়া গ্রহণ না করিয়া মোটামুটি বলিয়া গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। তাছাড়া এমন জাতিও আছে যেমন(তীওড়--তীবর) যাহার উল্লেখ মনুসংহিতায় রহিয়াছে কিন্তু বৃহদ্ধর্মপুরাণে পাওয়া যায়না। অথচ পশ্চিম-দিনাজপুর ও মালদহে এইজাতি এখনও বিদ্যমান-- এমনকি পশ্চিমদিনাজপুরে তিওড় নামে একটি স্থানও আছে এবং সেখানে সরকারী পোস্টাফিসও রহিয়াছে। আবার মানিকদত্তে নাই কিন্তু মালদহে এখনও আছে এবং বৃহদ্ধর্মপুরাণেও আছে-

এমন জাতি শৌণ্ডিক(শুন্ড়ী)। এই অনুপস্থিতির কারণ স্পষ্ট - মানিকদত্ত কাব্য লিখিয়াছেন,জাতির পরিগণনায় বসেন নাই। কাব্যকাহিনীর অনুরোধে যাহাদের উপস্থিতি প্রয়োজন মাত্র তাহাদেরই উল্লেখ করিয়াছেন।

মানিকদত্তের কাব্যে এইসব জাতি ছাড়াও সন্ন্যাসী ও যোগীদের উল্লেখ রহিয়াছে। সন্ন্যাসীদের নিকট বিশেষত: শিব আরাধনার কালে ব্যাঘ্র-চর্মের খুব সমাদর ছিল।দেশে কৃষকদের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা ঠিক বোঝা যায়না কিন্তু বন্য মহিষ ও ব্যাঘ্রের উৎপাতে যে তাহাদের দুর্গতি হইত তাহার প্রমাণ মানিকদত্তের কাব্যে আছে। সমাজে তখন বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কিছু ছিল বলিয়া মনে হয়না বরং বলা চলে সমাজ তখন রীতিমত স্মৃতিশাসিত। জ্ঞাতি সেকালে বিশেষত: নারীচরিত্রে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া প্রকট হইয়া উঠিত। ইহার প্রমাণ খুল্লনার ছবনে ছাগল চরানো ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞাতিবর্গের সংশয় এবং খুল্লনাকে পরীক্ষাদানে বাধ্য করানো। বিবাহ উপলক্ষে বাদ্যভাণ্ড সহযোগে বরানুগমন মানিকদত্তের কালেও বেশ প্রকট ছিল। এবং এই উপলক্ষে বাজী পোড়ানোরও একটা রেওয়াজ ছিল।এই সময়ে গৃহের চালা নির্মাণে খুব সম্ভব খড়ই ব্যবহৃত হইত। মানিকদত্ত গর্ভিনীর জীবনের প্রসবান্ত পর্যন্ত বিভিন্ন অবস্থার যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে মনে হয় এ বিষয়ে তাহার যথেষ্ট জানা ছিল। বিবাহান্তে কন্যার স্বামীগৃহগমনকালে স্বামীগৃহে চালচলন সম্পর্কে মাতার উপদেশ দেওয়ার রীতি ছিল। বরপক্ষের কর্তার কাছে কন্যার পিতার গলবস্ত্র হইয়া বিনীতভাবে ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করাও ভব্যতার পরিচায়ক ছিল। আজ্ঞাবহকে তথা কাহারও দ্বারা কোন কার্যউদ্ধারের জন্য আহ্বান করিয়া 'গুয়াপান' দিয়া তাহারও সম্মান করার রীতি ছিল। বিভিন্ন দ্রব্যের 'যোগ' ব্যবহার করাইয়া স্বামীকে পত্নীর প্রতি অনুরক্ত বা বিরক্ত করার প্রথা বর্তমান ছিল। স্বকীয় কার্যউদ্ধারের জন্য অসৎপন্থা অবলম্বনের জন্য বুদ্ধিদাতার অভাব ছিলনা। দুষ্কর্মকারীরাও নিজেদের কর্মের সমর্থনেও আগম-বেদের কথা বলিত। মৃতের জন্য অশৌচপালন ও জ্ঞাতিগোত্র লইয়া মৃতদাহন করার মধ্যে স্মার্ত আচার প্রতিপালনের নিয়ম দেখা যায়। ইহজন্মের সুখদু:খ যে পূর্বজন্মের সুকৃতি ও দুষ্কৃতিরই ফল এ ধারণা সমাজে দৃঢ়মূল ছিল। ডোমজাতীয় লোকেরা ব্যাঘ্রের তৈল সংগ্রহ করিয়া বাত রোগীর চিকিৎসা করিত। ধনিনেরা ব্যাঘ্রনখ সোনায় বাঁধাইয়া গলায় ধারণ করিত।

নারীদের ব্যবহার্য অলঙ্কারের মধ্যে মানিকদত্ত কয়েকটি উল্লেখ করিয়াছেন। নাকের অলঙ্কারের নাম ছিল বেসর। কর্ণের নিম্নভাগের অলঙ্কারের নাম কুণ্ডল,উপর কর্ণের অলঙ্কারের নাম ঢাকী ও উঝটিয়ান। কর্ণের নিম্নভাগে কেহ:কেহ কড়িও পড়িত। উপর হাতের অলঙ্কারকে বলা হইত বাজুবন্দ এবং সুবর্নতাড় ও আস্ফলতাড়। সধবাদের শঙ্খের নাম ছিল রামলক্ষণ শঙ্খ। মহিলারা কোমরে কিঙ্কিনি এবং পায়ে নূপুর পড়িত।

কেহ কেহ বা গায়ে বাকমল বা গাছলী বা বস্ত্ররাজও পড়িত আর গলায় পড়িত শতেশ্বরীর হার । আঙ্গুলে পড়িত রত্নখচিত অঙ্গুরী । মস্তকের অলঙ্করন হইত 'জাদ' দিয়া ।

মানিকদত্তের কাব্যে নিম্নলিখিত বাদ্যভাণ্ডের নাম পাওয়া যায় । যথা - দুন্দুভি, ঢাক, ঢোল, রায়বাঁশ, দামা, দগরা, বাঁশী, শিঙা, ভেউর, করনাল, তাম্বুর, রণকাড়া, কাড়া, খোল, করতাল, মৃদঙ্গ, জয়ঢাক, কাঁশি, রণশিঙা, রবাব, খঞ্জরি, দতরা, ঘাগড়, ঘুঘুরা, আরিন্দা মন্দিরা, বেণু প্রভৃতি । ইহা ছাড়া অস্ত্রের নামও অনেকগুলি পাওয়া যাইতেছে, যথা - মুদ্গর, চইকাতি, শেল, কামান, গুরুজ, বন্দুক, ঝাটি, ঝাড়, মুষল, বরশি, বল্লম, ঢাল, তীর, গুলি, শক্তিশেলপাট লৌহমুদ্গর, লৌহডাঙ্গ, কণিনাস প্রভৃতি ।

- - - - - - - - - - -

কাব্য-রূপায়ন।

মানিকদত্ত কালকেতু ও ধনপতির কাহিনী দুইটি অবলম্বন করিয়া চার চার দিনে গেয় মঙ্গলকাব্য রচনা করিয়াছেন, পুনরায় প্রতি চারদিনের গেয় অংশকে আট পালায় বিভক্ত করিয়া মোট ১৬ পালায় অষ্টমঙ্গলা গান রচনা করিয়াছেন। কাহিনীকে কাব্যরূপ দিতে তিনি প্রধানতঃ ত্রিপদী ও পয়ার এই দুইটি ছন্দের ব্যবহার করিয়াছেন। অবশ্য তাহার ত্রিপদী বা পয়ার ঠিক আধুনিক যুগের ত্রিপদী বা পয়ারের মত মার্জিত নয়। প্রতি-চরণের অক্ষরের সংখ্যায় এবং অন্ত্যমিলের ক্ষেত্রে আধুনিক কালের সহিত অনেক ক্ষেত্রেই পার্থক্য বিদ্যমান। কাব্যের কায়ানির্মিতির ব্যাপারে তিনি অতিরিক্ত কতকগুলি অংশের নাম করিয়াছেন। যথা - বোলাম, কথা, পদ ও দিশা। ক্ষেত্রবিশেষে অবশ্য পরবর্তী কালের গায়নদের দোষে অথবা লিপিকরদের প্রমাদে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। যেমন - ১০৩ পৃষ্ঠার যাহা নাচাড়ী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে তাহা আসলে খুব সম্ভব দিশা হইবে। ইহা ছাড়া তাহার লেখার অপর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি সব ক্ষেত্রে ত্রিপদীকে যেমন নাচাড়ী বলেন নাই তেমন কতক পদ বা পাঁচালী অংশের নাম দিয়াছেন নাচাড়ী। এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য এই যে আমাদের প্রাপ্ত পুঁথির শনিবারের দিবসের পালায় (পৃ. ১৮১ - ২০৩) এবং রবিবার দিবসের পালায় (পৃ. ২১৬ - ২২২) একটিও নাচাড়ী নাই। মূল লেখক যখন গানের মাধ্যমে চণ্ডিকা মাহাত্ম্য প্রচারে ব্রতী তখন বিশেষ বিশেষ পালা হইতে নাচাড়ী অংশকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক নয় বলিয়াই মনে হয়। ঠিক তেমনিই শনিবার রাত্রের পালায়ও (পৃ.- ২০৪ - ২১৫) একটি মাত্র ত্রিপদীর অবস্থান স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়না। এই সকল স্থলের ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য খুব সম্ভব লিপিকরদের দ্রুত লিপি করিয়া পালা শেষ করার তাগিদই দায়ী।

কায়ানির্মিতির ব্যাপারে মানিকদত্ত আরও দুইটি বিষয়ের ব্যবহার করিয়াছেন - তাহা হইল চৌতিশা ও বারমাসিয়ার ব্যবহার। ফুল্লরার একটি বারমাসিয়া, খুল্লনার একটি বারমাসিয়া এবং সিংহল-রাজকন্যা সুশীলারও একটি বারমাসিয়া অর্থাৎ মোট তিনটি এই কাব্যে পাওয়া যাইতেছে। ফুল্লরার বারমাস্যার বর্ণনা যদিচ দুঃখের এবং ~~তাহার~~ তাহার বাস্তব জীবনের সঙ্গে অনেকাংশে সামঞ্জস্যপূর্ণ তথাপি স্বামীর নিবিড় প্রেমানুভবের দিক হইতে তাহাকে দুঃখের বলা চলেনা। কিন্তু দেবীকে বিতাড়নের উদ্দেশ্যেই যে ইহা বর্ণিত সেকথা অনুভব করিতে অসুবিধা হয়না।

খুল্লনার বারমাসিয়ার বর্ণনার সময় - ধনপতির স্বর্ণপিঞ্জর নির্মানে গৌড়ে গমনের জন্য প্রস্থিতিকালে লহনা জাল পত্র নির্মান করিয়া সতীনকে যে কষ্ট দিয়াছে তাহারই বারমাসের বিবরণ। এবং এই বারমাসিয়া স্বামীর প্রত্যাবর্তনের পর বলিয়া খুল্লনা হৃদয়ের ভার লাঘব করিয়াছে।

অপর বারমাসিয়াটি পাই দক্ষিন পাটনের রাজকন্যা সুশীলার নিকট হইতে। সুশীলাকে বিবাহের পর শ্রীমন্ত যখন দেশে প্রত্যাবর্তনে একান্ত উন্মুখ হইয়া ওঠে সেই সময়ে তাহার সম্মুখে আগামী বারমাসের সুখের চিত্র তুলিয়া ধরিয়া তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টার ফল এই বারমাস্যা।

কবির কাব্যমধ্যে একটি 'দেব্যাস্তুতি' (পৃ. ৮৮-৮৯) ও দেবীর নিজমুখনিঃসৃত একটি 'শতনাম' ছাড়াও চৌতিশ অক্ষরে নির্মিত তিনটি চৌতিশা-স্তুতি পাওয়া যাইতেছে। প্রথমটি পাই কলিঙ্গরাজ সুরথের কারাগারে নিক্ষিপ্ত কালকেতুর মুখে, দ্বিতীয়টি পাওয়া যাইতেছে মগরাদহে নিমজ্জমান সপ্তডিঙ্গা দেখিয়া ত্রস্ত শ্রীমন্তের মুখে। তৃতীয়টিও পাইতেছি শ্রীমন্তেরই মুখেই - দক্ষিনমশানে যখন তার শিরঃচ্ছেদের জন্য লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

ভণিতা :-

মানিকদত্ত রচিত আমাদের প্রাপ্ত পুঁথির সম্পূর্ণপাঠে আমরা যে সব ভণিতা অংশ পাই তাহা লক্ষ্য করিলে আমাদের সম্মুখে যে চিত্র ফুটিয়া ওঠে তাহা নিম্নরূপ।

কবি তাহার কাব্যে ভণিতাংশে মোট ১৫ বার[1] ভবানীর উল্লেখ করিয়াছেন, দুর্গার উল্লেখ করিয়াছেন ১২ বার[2], অভয়ার উল্লেখ আছে ১৮ বার[3], এ ছাড়া চণ্ডী, মহামায়া ও পার্ব্বতী উল্লিখিত আছে একবার করিয়া। আরও কিছু ভণিতা কাব্যমধ্যে আছে যেগুলিতে দেবীর কোন উল্লেখ নাই। যেমন-'ভাবিয়া মানিকদত্ত মঙ্গল রচিল।' পৃ.--৮৩, 'কবি মানিকদত্ত গান মধুরসবানী' পৃ.--১৮০, 'গাইল মানিকদত্ত মধুর ভারতী।' পৃ.৩২৪। সম্পূর্ণ কাব্যের মধ্যে প্রায় চল্লিশটি স্থানে ভণিতা অংশগুলিতে শুধুমাত্র 'ভণিতা' বা 'অত্রভণিতা' দিয়াই শেষ করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহা পরবর্তী লিপিকার বা গায়নদের সংক্ষেপ করণের কৌশল। এসব ছাড়া আরও প্রায় ৯১ টি স্থানে ভণিতা থাকা উচিত ছিল বা ভণিতা অংশের সম্ভাবনা ছিল কিন্তু সে সব স্থানে ভণিতার কোন চিহ্নমাত্র নাই - ভণিতা ছাড়াই পদ শেষ করা হইয়াছে। কবি নিজেও এই অংশগুলিতে ভণিতা বর্জ্জন করিয়া থাকিতে পারেন। আমাদের মনে কবির ভণিতা বর্জ্জনের পক্ষে যুক্তি এইযে কবি সম্ভবতঃ বার বার নিজের নাম উল্লেখে বা নাম প্রচারে খুব একটা ইচ্ছুক ছিলেননা। কারণ হিসাবে আমরা বলিতে পারি যে -

---

১. পৃঃ - ২, ১৫, ১৬, ১৮, ২১, ৩৪, ৪১, ১৮৯, ২০৩, ২১৫, ২২১, ২৮৫, ২৯৩, ২৯৫, ২৯৬।

২. পৃঃ - ৩২, ৩৩, ৩৪, ৫৪, ১০১, ১১৮, ১৩৯, ১৭৪, ২২২, ২৪৩, ২৫০, ২৮২।

৩. পৃঃ - ৪৮, ৫৪, ৫৫, ৬৬, ৯৯, ১০১ (দুইবার), ১৪৫, ১৪৬, ২০৮, ২২২, ২৩৫, ২৬০, ২৬৭, ৩০১, ৩০৩, ৩২২, ৩২৩।

কাব্যমধ্যে কবির ব্যক্তিগত পরিচয় বা বংশতালিকা তথা বাসস্থানের বিস্তারিত বর্ণনা আমরা কোথাও পাইনা । ব্যক্তিগত পরিচয় দানে কবির সঙ্কোচ এই ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় ।

যে তিন ধরণের ভণিতা কবি অধিক সংখ্যক বার ব্যবহার করিয়াছেন তাহা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তিনি একই রকম ভণিতা বার বার ব্যবহার করেন নাই । প্রতিটি ভণিতাকেই প্রায় বিভিন্নভাবে কাব্যমধ্যে প্রয়োগের চেষ্টা সম্ভবতঃ কবির মধ্যে ছিল । ইহাও অধিক সংখ্যক ভণিতা রচনার ক্ষেত্রে কবির নিকট বাধার সৃষ্টি করিয়া থাকিতে পারে । যেমন 'ভবানী' প্রয়োগের ক্ষেত্রে - (১) পাইল মানিকদত্ত ভাবিয়া ভবানী । পৃ.-২

(২) ভবানীর চরণে গীত মানিকদত্তে গায়ে ।
ভক্ত নায়েকের দুর্গা হৈবে বরদায়ে ।। পৃ.-৩৪

(৩) মানিকদত্তে গান করে ভবানীর দাস ।
কবিমুখে পদ করিল প্রকাশ ।। পৃ.- ৪১

আবার 'দুর্গা' ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বিভিন্নতা লক্ষ্য করি । যেমন-

(১) দুর্গার চরণে ভয়ে   কবি মানিকদত্তে গায়ে
দেব চরণে মধুরস্নান । পৃ.- ৩২

(২) দুর্গার চরণে ভয়   হউক দূর ভবভয়
দত্ত কহে কবি জোড়কর ।। পৃ. - ৩৩

(৩) রচিল মানিকদত্ত দুর্গার চরণ । পৃ. - ৫৪ ।

'অভয়া' ব্যবহারের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করি কবির ভিন্ন প্রয়োগের প্রচেষ্টা ।
যেমন - (১) রচিল মানিকদত্ত অভয়ার বরে । পৃ.-৪৮ ।
(২) অভয়া প্রসন্নে গীত মানিকদত্তে গায় ।
নায়েকের কল্যান করিবে মহামায় ।। পৃ. -৫৪
(৩) অভয়া প্রসন্নে গীত মানিকদত্তে গায় ।
চণ্ড প্রচণ্ড দেবি হৈবে বরদায় ।। পৃ. -১৪৫

এই কাব্যে ভণিতাতে চণ্ডী প্রসঙ্গ পাই মাত্র একটি জায়গায় । অর্থাৎ পুঁথির ২৬১ সংখ্যক পৃষ্ঠায় । যথা -

'পাইল মানিকদত্ত চণ্ডীর চরণে' ।।

য মানিকদত্ত তাহার কাব্যে 'অভয়া' নামই ভণিতায় অধিক সংখ্যক বার ব্যবহার করিয়াছেন, সেই সূত্রে এই কাব্যকে 'অভয়ামঙ্গল' বলা যাইতে পারে কিন্তু শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয়ের একটি মন্তব্যকে গ্রহণ করিয়া আমরা একথা বলিতে পারি যে এ অবধি মানিকদত্তের কাব্য লইয়া যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই মানিকদত্ত রচিত -

মঙ্গল গ্রন্থটিকে 'চণ্ডীমঙ্গল' নামে অভিহিত করিয়াই আলোচনা করিয়াছেন। যেমন- শ্রীহরিদাস পালিত[১], রজনীকান্ত চক্রবর্তী[২], তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য[৩], ভবেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী[৪], অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেন[৫], ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়[৬], ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য[৭] প্রভৃতি।

অধ্যাপক ডক্টর সেনের মন্তব্যটি অবশ্য মুকুন্দরামের কাব্যকে অবলম্বন করিয়া। যথা - 'মুকুন্দরামের কাব্যের আসল নাম বলিতে 'অভয়ামঙ্গল'। কবি ভণিতায় এই নামই বেশি ব্যবহার করিয়াছেন। এবং কাব্যের অধিদেবতা মঙ্গলচণ্ডী ও অভয়া দুর্গা। তবে চণ্ডীমঙ্গল নামই চলিয়া গিয়াছে।''[৮] শ্রদ্ধেয় শ্রী সেন মহাশয়ের এই স্বীকৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমরাও মানিকদত্তের কাব্যকে 'চণ্ডীমঙ্গল' নামেই নির্বিদ্বিধায় চালাইয়া দিতে পারি।

১.২.৩. - সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ, যথাক্রমে সংখ্যা - ১৩১৭ পৃ. ২৪৭-৫৬, ১৩১১ পৃ. ৩৩-৩৬, ১৩৪৫ পৃ. - ১১৪

৪. - 'মানিকদত্তের মঙ্গলচণ্ডী' নামক প্রবন্ধ। প্রকাশিত - 'প্রতিভা' পত্রিকা - ১৩২০ অগ্রহায়ন পৌষ সংখ্যা, পৃ. ২৯০ -৯৬।

৫.৮. - বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস - চতুর্থ সংস্করন পৃ. সংখ্যা যথাক্রমে ৪৯৬-৫০৭ ও পৃ. ৫১৪।

৬. - বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত- দ্বিতীয় খণ্ড - দ্বিতীয় সংস্করন। পৃ.১৩৫-১৪৪

৭- বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস- পঞ্চম সংস্করন - ৪৫৬ -৬৩।

নাচাড়ী

প্রভাতে উঠিয়া দত্ত পুঁথি দেখে নাড়ি ।
তিনলক্ষ পুস্তকমধ্যে আছেন নাচাড়ী ।।
তিনলক্ষ দূরে রাখি তিনশত কৈল ।
বত্তীশ নাচাড়ী গীত অধিক রাখিল ।।
তিনশত বত্তীশ নাচাড়ী রচিত হইল গান ।
পদ দিশা তাতে অনেক করিল মূর্তিমান ।। পৃ.-১৩০

কাব্যমধ্যে কবির এই ধরণের উক্তি অনুযায়ী নাচাড়ীর মোট সংখ্যা ৩৩২ হওয়া উচিত কিন্তু সর্বমোট নাচাড়ী আমরা পাই ৭৭ টি । সব ত্রিপদী ছন্দগুলিকে নাচাড়ীর অন্তর্ভুক্ত করিলে সংখ্যা আরও বাড়িতে পারে । আমাদের যে সাধারণ ধারণা তাহাতে দেখি নাচাড়ী অংশ শুধুমাত্র ত্রিপদী ছন্দই রচিত হইয়া থাকে কিন্তু মানিকদত্তের কাব্যমধ্যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় । এই কাব্যে শুধুমাত্র ত্রিপদী ছন্দই নয় পদমধ্যেও অর্থাৎ পয়ারেও বা দুইটি পদের মিলকে লইয়াও কবি নাচাড়ীর সৃষ্টি করিয়াছেন ।

(তবে নাচাড়ী , ত্রিপদী , পদ, দিশা , বোলাম, কথা এই ছয় অংশে গোটা কাব্যখানি বিভক্ত বলিয়া ধরিলে ইহাদের মোট সংখ্যা হয় ২২৫ । সুতরাং ৩৩২ এ বর্তমান পাঠেও পৌঁছানো যাইতেছেনা । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে দুইটি কাহিনীর স্থলবিশেষে আমরা ইতঃপূর্বে যে কাহিনী ধারায় অসংলগ্নতার কথা বলিয়াছি (পৃ.-৩৮) সেই অংশগুলিকে ভবিষ্যতে প্রাপ্য পুঁথি হইতে যোগ করিলে সংখ্যা হয়তো ৩৩২ এর কাছে যাইতেও পারে । এ বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহন এখনও চলেনা ।)

যেমন পদে নাচাড়ীর দুটি উদাহরণ :-

নাচাড়ী - (১)

ভাঙ্গিয়া ফেলিল মহাবীর নাড়ার কুড়ীয়া ।
শাসন করেন মহাবীর পুরিটো মুড়িয়া ।। [১]

(২)

বলি মহে বলি তুমি গঙ্গা বড় পুন্যবান ।
আমার কলিঙ্গে তুমি হইয়া দেহ বান ।। [১]

ত্রিপদীতে নাচাড়ীর একটি উদাহরণ :-

চলহে সুন্দরী পথ অনুসারি
ই তোর ব্যবহার নয় ।
ফুল্লরার নিজপতি অন্দর আইফটি
কুলেক নাই তোর ভয় ।। [২]

---

১. - মূলপুঁথি পৃ. সংখ্যা - ১০০ ও ১০৬ ।
২. - ,, ,, - ৮০ ।

কিন্তু সব ত্রিপদীই আবার নাচাড়ী নয়, যেমন একটি উদাহরণ :-

শুন ২ সর্বজন কার্ত্তিকের বিবরণ
যে রূপে কার্ত্তিক জন্মিল।
রতিরঙ্গ কুতূহলে শিবের বির্য্য টলে
দুর্গা তাকে উদরে ধরিল।। [১]

যাহাই হউক ত্রিপদী ও পদ বা পয়ার ছন্দের নাচাড়ী একত্র করিলেও ৩৩২ সংখ্যায় উপনীত হওয়া যায়না। এমনকি কাব্যমধ্যে সব ত্রিপদীগুলিকে নাচাড়ী মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিলেও কবি প্রদত্ত ঐ সঠিক নাচাড়ী সংখ্যা নির্ধারন অসম্ভব হইয়া পড়ে। কবি নিজ উক্তি অনুযায়ী তাঁহার কাব্যমধ্যে হয়তো নাচাড়ী সংখ্যা ঠিকই রাখিয়াছিলেন কিন্তু পরবর্ত্তী লিপিকারদের নিজস্ব ভ্রমপ্রমাদহেতু বা যথাযথ লিপিতে শৈথিল্য ও অমনোযোগহেতু তথা অল্পবিদ্যাজনিত দোষহেতু আমরা বর্ত্তমানে এই কাব্যের যে পুঁথি পাইতেছি তাহাতে সঠিক নাচাড়ী সংখ্যা নির্ধারনে ব্যাঘাত ঘটে। কবির স্বহস্তলিখিত কোন পুঁথি আমাদের হস্তগত হইলে এ সংশয় বা সমস্যা দূরীভূত হইতে পারিত কিন্তু যতদিন না তাহা হইতেছে ততদিন একথা জোর করিয়া বলা কোনমতেই সম্ভব নয় যে কবির কাব্যে নাচাড়ী সংখ্যা ও কবি কর্ত্তৃক বর্ণিত নাচাড়ী সংখ্যা এক নয়। অবশ্য শ্রীমদ্ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত শ্লোকসংখ্যার সহিত তাহার অন্তর্বর্ত্তী শ্লোকসংখ্যার সাদৃশ্য দেখা যায় না। অতএব এক্ষেত্রে ৩৩২ টি নাচাড়ী হইতেই হইবে বা কবির স্বলিখিত কাব্যে ঠিক ঠিক ৩৩২ টি নাচাড়ী পাওয়া যাইবেই এমন কথাও জোর দিয়া বলা সম্ভব নয়।

কবির বর্ণনা অনুযায়ী নাচাড়ী ছাড়াও কাব্যমধ্যে আমরা পদ ও দিশার সন্ধান পাই। এসব সম্পর্কে কবি কোন সংখ্যা নির্ধারণ করেন নাই; তাই ইহাতে কোন গোলযোগের সম্ভাবনাও নাই। এ ছাড়াও কাব্যমধ্যে আছে ছন্দ, রাগ, বোলাম, কথা প্রভৃতি। ছন্দমধ্যে আমরা পাই সাধারনতঃ হালিছন্দ[২] ও করুণাছন্দ[৩] XXXXX, রাগমধ্যে পাই পাহাড়ীরাগ[৪] ও কামোদরাগ[৫], আর পাই বোলাম[৬]। এছাড়া কবি কোথাও কোথাও পদ অংশে পাঁচালী কথাটিও ব্যবহার করিয়াছেন। বোলাম অংশে আমরা পাই - পাত্রপাত্রীর কথোপকথন অথবা একক উক্তি - ইহা কখনও নাচাড়ীতেও আছে। যেমন পৃ.৬২ পদ অংশে পাই - কবির কাহিনী বিবৃতি। কথা অংশে ~~পাই~~ - কবির কাহিনী বিবৃতি এবং পাত্রপাত্রীর কথোপকথন দুইই আছে। দিশা অংশে পাই - ভাবাবেগ প্রকাশ সংক্ষেপে - আরাধ্যকে সম্বোধন করিয়া বা শ্রোতৃবর্গকে সম্বোধন করিয়া - বা কোন অভিজ্ঞতা-প্রসূত নীতির কথা প্রকাশ করিয়া অথবা পাত্রপাত্রীর আবেগকে সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়া। আর নাচাড়ী অংশে পাই - নাচ সহযোগে ঘটনার বিবৃতিদান।

---

১. - মূল পুঁথি পৃ. সংখ্যা ১৬।
২. - ,, ,, - ১৬০।
৩. - ,, ,, - ১৫৪, ১৬২।
৪,৫. - ,, ,, - ৬৪, ৬৫, ১৪০, ১৪২, ১৬৬। মূল পুঁথি পৃ. সংখ্যা.- ৮০, ১৫৭

দিশা -

মানিকদত্ত তাহার কাব্যের কালকেতু ও ধনপতি অংশে যথাক্রমে ২৬ ও ৩১ টি দিশা ব্যবহার করিয়াছেন - অন্ততঃ আমাদের প্রাপ্ত পুঁথি অনুযায়ী । এতদ্ব্যতীত আরও আটটি স্থলে যাহা পদ বা নাচাড়ী বলিয়া উল্লিখিত আছে তাহাও দিশার প্রকৃতি অনুযায়ী পদ বা নাচাড়ী অংশভুক্ত না হইয়া বরং দিশা অংশেরই অন্তর্গত হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে হয় । লিপিকর প্রমাদবশতঃ এই বিপর্য্যয় হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয় । দিশা অংশগুলি এক হইতে চার পংক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ । ইহা প্রধানতঃ কবিচিত্তের ভক্তির উৎসার - যে ভক্তির লক্ষ্য দেবীর নিকট আকুল প্রার্থনা জানান । কবি বুঝিয়াছেন দেবীর বিষম মায়াজালে সমস্ত জগৎ আবদ্ধ হইয়া দুঃখযন্ত্রনা ভোগ করিতেছে এবং তাহা হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায় দেবীর পদতলে আশ্রয় পাওয়া । মা মঙ্গলচণ্ডীই মাত্র ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারেন । দুই একটি স্থলের দিশা অংশে কবি হরি ও রামকে স্মরণ করিয়াছেন , কিন্তু সে সকল স্থানে কোন আকুল প্রার্থনা দেখিনা । একটি স্থলে 'কৃষ্ণ' নামও আছে , যেমন -

দণ্ডের রাজা নারে খয়রে ।
আরে কৃষ্ণ হরি রাম হরি হা এএ।। পৃ. ১১৮ ।

এই 'কৃষ্ণ' শব্দটির এই বিশেষ স্থলে উল্লেখের কোন প্রাসঙ্গিকতা নাই বলিয়াই মনে হয় । স্বকীয় রাজ্যের ভগ্নদশা দেখিয়া রাজা সুরথের এই ব্যাকুল আকুতি কবি প্রকাশ করিয়াছেন । এখানে ঠিক গৌড়িয় বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব পড়ে নাই । বরং মনে হয় কলির তারক ব্রহ্ম নামের মধ্য হইতেই এই নামটি বাংলায় প্রচলিত ছিল । রাধাকৃষ্ণের মিলন বিরহের কথা বাংলাদেশ শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বে একেবারেই জানিতনা একথাও দাবী করার যুক্তি নাই ।

অপর একটি দিশাতে পাই - শ্যামসুন্দর নাগিয়া ।
সদাই আকুল করে হিয়া ।। পৃ. ১৪২

এখানে এই শ্যামসুন্দরের উল্লেখ আসিয়াছে তখনই যখন খুল্লনা স্বপ্নে দক্ষিণপাটনে ধনপতির বন্দীদশার কথা জানিলেন । জাগিয়া উঠিয়া ভূমিতে 'গড়ি' দিয়া কান্দিতে খুল্লনা বলিয়াছিল 'রূপের মুরলি মোর কে লইল হরিয়া' - ইহার দুই ছত্র পরেই উক্ত দিশাটি পাওয়া যাইতেছে । রাধাকৃষ্ণের বিচ্ছেদ অবস্থার কাতরতাই এখানে নায়িকা নিজের মধ্যে আরোপ করিয়া লইয়াছে । 'শ্যামসুন্দর' শব্দটি উল্লেখ আরও একবার পাওয়া গিয়াছে -

শ্যামসুন্দর বটে ব্যাধের কুমার ।
ধীরে ২ দড়ি দিল গলার উপর ।। পৃ. ১৩৩ ।

এখানে শ্যামসুন্দর শব্দটি কালকেতুর শারীরিক সৌন্দর্য্য বুঝাইতেই প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় ।

এই দিশা অংশে কবি একবার 'বিধাতা'কে স্মরণ করিয়াছেন (পৃ. ১০৪ এই বিধাতার উল্লেখ হইয়াছে ঠিক সেই সময় যখন কালকেতু চতুর্দ্দারের যুদ্ধে জয়ী হইয়া গৃহে আসিয়া বন্দী হইয়া পড়িল। তাহার জয় ভবানীর সহায়তায়- সুতরাং পরাজিত শত্রু আসিয়া তাহারই নিজের গৃহে তাহাকে অনায়াসে বন্দী করিবে ইহাই তাহার পরম বিস্ময়। দেবীর অনুগ্রহ নিগ্রহের ঊর্দ্ধেও তাহা হইলে একটি অদৃষ্ট শক্তি কাজ করিয়া গিয়াছে বলিয়াই যেন কবি এখানে 'বিধাতা'কে স্মরণ করিয়াছেন।

দেবী দীনদয়াময়ী বলিয়াই কবির অন্তরে ভরসা আসিয়াছে। শিবনাথের শরণ লইলেই 'তাপের তাপিত তনু জুড়াইবে'। স্মরণ করেন কবি দুর্গাকে তারিনী শিবানী বলিয়া। কবি সকলকে সঙ্গে লইয়া দুর্গা দর্শন করিয়া জন্ম সফল করিতে আগ্রহী। দুরিত ভঞ্জিনীর কাছে দয়া প্রার্থনা করেন কবি। জন্মে জন্মে যেন কবির ভক্তি থাকে দেবীর চরণে ইহাই কবির ~~একান্ত~~ একান্ত বাসনা। কবি মায়ের চরণে শরণ মাগেন। তাঁহার পদচ্ছায়ায় আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কবি জয়ধ্বনি দিতেছেন চামুণ্ডা দেবীর - যখন যুদ্ধে শ্রীমন্তের পক্ষে তিনি চামুণ্ডা মূর্ত্তি ধারণ করেন। হরগৌরী ছাড়া আর শরণ্য নাই, তাপিত তনু জুড়াইবার অন্য স্থান নাই।

দুইটি মাত্র দিশাতে কবির ভারতচেতনা প্রকাশ পাইয়াছে। বুঝা যায় কবি ভারতের মত পুণ্য ক্ষেত্রে জন্মলাভের সুযোগ পাইয়াও কোন পুণ্যকর্ম করিতে পারিলেন না এজন্যই কবির আক্ষেপ। পৃ. -২০২

হে দয়ে ভারত ভূমে জন্ম নিলাম গো মা।
ভারত ভূমে কি কাজ কৈলা প মা ।।
ভারত ভূমে কি ফল পাল্যা গো মায়া ।।

অপরটি পৃ. ১১৭ - ওরে ভারত ভূমে জনম লইলাম মা।
ভারত ভূমে কি কাজ কৈলাম গো মা ।।

অন্যান্য ক্ষেত্রের দিশাগুলি ঘটনা বা পাত্রপাত্রীর বিশেষ বিশেষ অবস্থার সহিত সম্পৃক্ত। তাহারা আনন্দ বা দুঃখে বা বিপন্ন অবস্থায় পড়ায় তাহাদের মনে যে যে ভাবের জাগরণ হওয়া সম্ভব কবি দিশার মাধ্যমে সেই ভাবগুলিকেই সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছেন। কালকেতুর কাহিনীতে দেবীকে ব্যাধগৃহে দেখিয়া ফুল্লরার সন্দেহভাবের প্রকাশ এইভাবে হইয়াছে দিশার মাধ্যমে - রামা কেন আইলে গো।
কেন আইলে বীরের মন্দিরে ।। পৃ.-৮৭

ধনপতির উপাখ্যানে মগরাদহে ধনপতির ছয়টি ডিঙ্গা ডোবার পর তাহার স্বকার্য্য সাধনে একান্ত নৈরাশ্য আসে, এখন যেন সে কাণ্ডারদের ফিরিয়া যাইতেই বলিয়া বসে। 'কাণ্ডার বাহ ডিঙ্গা যাব উজানী'। পৃ.২০৫

এখানে উল্লেখ্য যে ১ম পালায় যেখানে পৌরাণিক কাহিনীর (সৃষ্টিখণ্ড) বিবৃতিরই প্রাধান্য অর্থাৎ কালকেতু বা ধনপতির কাহিনীর আরম্ভ হয় নাই সেই প্রথম পালায় কোন দিশা নাই। আর নাই ধনপতির আখ্যান সমন্বিত ৯ম, ১০ম, ও ১১ শ পালায়।

ভাষা-বৈশিষ্ট্য -

মানিকদত্তের কাব্য মধ্যে এমন কতকগুলি প্রয়োগ পাওয়া যাইতেছে যাহার ভাষাতাত্ত্বিক গুরুত্ব আমাদের মনে হয় বিশেষভাবে লক্ষনীয়। ইহা ছাড়া এমন কতকগুলি শব্দ পাওয়া যাইতেছে যেগুলি প্রাচীণ বাঙলায় শুধু ব্যবহৃত হইত, ইদানীং কালে সেই সবের প্রয়োগ নাই বলিলেই চলে। নিম্নে ইহাদের কতকগুলি উল্লেখ করা যাইতেছে :-

বহুবচন গঠন - (১) কতকক্ষেত্রে একবচনের দ্বারাই বহুবচন বুঝান হইয়াছে।

যেমন - ক) কোতাল বলেন প্রজা শুন মোর ভাই। পৃ. ২৮

খ) পুরুর নিকটে আসি দিল দরশন। পৃ. ৩৮

গ) বৃক্ষের প্রধাণ তবে সৃজিল দ্বিজন। পৃ. ৩৮

ঘ) চিত্তারে মণ্ডলগণ গাএ কর বল
ভবানী আইল তোর ঘরে। পৃ. ১০৩

ঙ) কান্দে গুজরাটের লোক মুণ্ড হাত দিয়া।
কি দোষে রাজা লোক যাইছে ছাড়িয়া।। পৃ. ১৪৩

চ) বনমধ্যে একশত ছেলিকে পাইল।।
খুলনা কোল দিঞা বলেন ছেলিরে।
ছেলির প্রসাদে আমি দেখিলাঙ দুর্গাকে।। পৃ. ২০১

ছ) বারগণ্ডা বিড়াল আনা দেখিতে ভোজন।
বিড়ালক খাত্তো দিল অন্ন ব্যঞ্জন।। পৃ. ২০৩

(২) 'রা' দিয়া বহুবচন -

ক) সাধু সদাগর আরা তার কন্যা কর তোরা
জে তোরে বুকে বৈঠা বাএ। পৃ. ১০৭

(৩) 'গোলা' দিয়া বহুবচন -

ক) মাতা আপন বন্ধন দড়ি শিব বিনে হরগৌরী
বড় দুঃখে পশুগোলা মরে। পৃ. ৬৮

খ) হস্তপদের বন্ধনগোলা বিমচন হৈল। পৃ. ৬৯

গ) এতগোলা নফর তোরা নালমা হিনা খাও। পৃ. ১১৭

ঘ) না জানি ছাগলগোলা হরি নিল কে। পৃ. ১১৮

ঙ) দুঃখগোলা ধনপতির সকল হরিল।। পৃ. ২৪১

(৪) 'গুলি' দিয়া বহুবচন -

ক) খালে হৈতে চালগুলি   পুরিয়া পতিশুলী
দ্বাদশলম্বিত ঝুলি দোলে ।। পৃ. ৪০

(৫) 'গণ' দিয়া বহুবচন -

ক) কলিঙ্গের চারিমণ্ডল   শুইয়া নিদ্রা জাএ ।
ভগবতী বসিল শিয়রে ।।
চিতরে মণ্ডলগণ   গাএ কর বল
ভবানী আইল তোর ঘরে । পৃ. ১০৩

(৬) গৌরবে 'গণ' শব্দ প্রয়োগে বহুবচন -

ক) মা মঙ্গলচণ্ডীগণ । (কাব্যমধ্যে বহুশঃ প্রযুক্ত) ।

(৭) 'আদি' দিয়া বহুবচনের ভাবপ্রকাশ -

ক) ইন্দ্র আদি দেবতা । পৃ. ১৪
খ) ব্রহ্মা আদি দেবগণে ...। পৃ. ২০

'দিগ' এবং 'দে' প্রত্যয় দিয়া যে বহুবচন তাহা এই গ্রন্থের মধ্যে কোথাও পরিলক্ষিত হয়না ।

দ্বি-বচন গঠন :-

(১) একবচন দিয়া দ্বিবচনের অর্থ প্রকাশ -

ক) দুর্গা বলে দুইব্যাধ শুন বিদ্যমান ।
পুত্র হঞা আমাকে দেখাহ ধনুর্ব্বাণ ।।
শিবের ঘামে জন্মিয়াছ শিব তুমার পিতা ।
শিবের নারী দুর্গা আমি হই তুমার মাতা ।। পৃ.৫০

খ) দুইজনা ব্যাধ পশু মারে বিজুবনে ।।
ব্যাধকে দেখিঞা বলিলাও আক্ষেপ করি ।
ব্যাধজন্ম হৈলে আমি খাত্যাও পশু মারি ।। পৃ. ৫২

(২) 'রা' দিয়া দ্বি-বচনের প্রকাশ -

ক) ধর্ম্মকেতু স্বর্ণকেতু তারা দুইভাই । পৃ. ৫৬

কারক-বিভক্তির প্রয়োগ :-

(১) তাদর্থ্য এবং তুমুন্নর্থ বুঝাইতে 'ক' 'কে' বিভক্তির প্রয়োগ -

ক) (৭মী ৪+ক,) জাতিকুল জদি চাও   ফিরিয়া ঘরেক জাও
নহে স্ত্রীহত্যা দিব আমি । পৃ. ৮০

খ) দেশকে জাইবা কঠিন তোমার হিয়া ।
ছাড়িছ গোউড় দেশ কি দোষ দেখিয়া ।। পৃ. ২০৭

গ) ইহলোক পরলোক তরিবাক চাই ।
কালিদহে মহারাজা কমল দেখি নাই ।। পৃ. ২৭৮

(২) ৭মী বিভক্তি দিয়া অপাদান কারক প্রকাশ -

ক) রাজার সভাতে আইল সাধু ধনপতি ।
দোলাতে নামিয়া সাধু করিল প্রণতি ।। পৃ. ২২৪

(৩) ৭মী বিভক্তি + 'হইতে'-যোগে অপাদান কারক -

ক) থালে হৈতে চালুগুলি পুরিয়া পতিশুলী
দ্বাদশনম্বিত ঝুনি দোলে ।। পৃ. ৪০

(৪) 'ক' দিয়া ৬ষ্ঠী বিভক্তি -

ক) যেমন, কড়াক -
রাজা বলে বাণিয়া কড়াক লাগিয়া মরে ।
অরকায়ে না করে বিবাহ ধনখরচের ডরে ।। পৃ. ১৬৬

(৫) 'কের' দিয়া X ৬ষ্ঠী :-

ক) কড়াকের সম্বল নাই জে ঘরে বসিয়া খাব । পৃ. ৬৭

'হি' জাত নিশ্চয়াত্মক(emphatic) 'ই' মূল শব্দের পরে বসিয়া তাহার পর বিভক্তি গ্রহণ । :-

ক) ক্রোধ হঞা রণ করে জত রাজসেনা ।
সকলির প্রাণ মারে চণ্ডিকার দানা ।। পৃ. ২১৭

খ) পূর্বদিগে রাজসেনা গেল সব মারে ।
গেল সকলিকে দুর্গা দশ হস্তে ধরে ।। পৃ. ২১৭

ইল প্রত্যয়ান্ত শব্দের বিশেষণরূপে প্রয়োগ :-

ক) পাকিল মাথার কেশ শন্তার হইল।
কপালের মাংসে তার দুই চক্ষু ঢাকিল ।। পৃ. ৪২

সমাপিকা-ক্রিয়ার অনুসর্গরূপে অসমাপিকার ব্যবহার(আভিমুখ্য বুঝাইতে):-

ক) দেবী বলে পদ্মাবাছা হের দেখসিয়া ।
ভক্তজনে লইয়া জায়ে আমাকে বান্ধিয়া ।। পৃ. ৬৭

খ) এহি পুথিকা তুমি করগা বন্ধন । পৃ. ৬৮

গ) শুনহ ব্রাহ্মণ তুমি শুন মোর কথা ।
শালবান রাজাকে গিঞা কহগা বারতা ।। পৃ. ৩০২

যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার :-

ক) দুর্গা বোলে কিবা তপ কর ইন্দ্র অধিকারি ।
কাযে পীড়িত হঞাআছে শচী নারী ।। পৃ. ৪২

যৌগিক কালের প্রয়োগ :-

ক) নদীর কূলের ভাঙ্গ করে সড় ২ ।
পড়িতেআছে ভাঙ্গের বাড়ি ভাঙ্গের উপর ।। পৃ. ৩১

খ) পূর্বদিন গরুড় বীর করিয়াছিল একাদশী ।
পারণা করিতে তার পাইয়াছেন দ্বাদশী ।।
উপপঞ্চাশ হস্তী গোটা ধরিআছিল ঠোটে ।
শ্রীরামস্মরণে সকল খায় গোটে গোটে ।। পৃ. ৭২

তদ্ভব অনুসর্গ 'তরে' < অন্তরে, বিভিন্নভাবে প্রযুক্ত :-

(১) ষষ্ঠী বিভক্তি + তরে = দ্বিতীয়ার/চতুর্থীর/তুমুন্নর্থে -

ক) তার তরে কৃপা কৈল মঙ্গলচণ্ডি রাই । পৃ. ৪৪

খ) গোধিকারূপে গেলাঙ কেতুক ধন দিবার তরে ।
ভালমন্দ না জানে ব্যাধ বান্ধে মোর তরে ।। পৃ. ৬১

গ) ধনপতি পুনর্মিল লক্ষপতির তরে ।। পৃ. ১৭০

ঘ) এক কথা লক্ষপতি বলি তোমার তরে । পৃ. ১৭০

ঙ) আগে জিজ্ঞাসিয়া আসি রম্ভাবতীর তরে । পৃ. ১৭০

চ) তোমার খুল্লনা হৈল সপ্ত বৎসরে ।
এহি সময় বিবাহ দেহ ধনপতির তরে ।। পৃ. ১৭১
(এখানে তরে = সঙ্গে)।

(২) ষষ্ঠী + তরে = প্রযোজ্য কর্তা -

ক) খুল্লনার তরে তুমি রাখাইলে ছেলি । পৃ. ২১৫

নামধাতুর প্রয়োগ:-

ক) আমার ইষ্ট নাই কুটুম্ব নাই যে তারে পদার্থিব ।
কড়াকের সম্বল নাই যে ঘরে বসিয়া খাব ।। পৃ. ৬৭

খ) চারিতান কাচুলি মোকে নির্মাইয়া দিবে ।। পৃ. ৭০

গ) শিবের আজ্ঞাতে দুর্গা বচন দৃঢ়াইয়া ।
কর্ণমুনির জীব নইল আচলে বান্ধিয়া ।। পৃ. ১৫৫

ঘ) রান্ধিয়া বাড়িয়া অন্ন দেইত ঢালিয়া ।
ভক্ষন না দেখে কানা বেড়ায় হাস্তাইয়া ।। পৃ. ১৭২

ঙ) তেজিয়া রন্ধনশাল ক্রোধে হইল চণ্ডাল
ব্যাঘ্ররূপে বাহিরাইল লহনা । পৃ. ২২৪

চ) এইমতে স্থানে ২ পুত্র তল্লাসিল ।
কুনখানে খুল্লনা পুত্র না পাইল ।। পৃ. ২৪৭

(ছ) কেহু রথে কেহু গজে কেহু বা ঘোড়াতে ।
কেহু পদব্রুজি চলে নানা অস্ত্র হাতে ।। পৃ. ২১৪

(জ) মশরাতে ডুব্যা মল্য আর বাপ ভাই ।
কি বল্যা পাত্যাব আমি তা সভার ঠাই ।। পৃ. ৩১৩

জোড় কলম শব্দ :-

ক) আমি বড় ২ গুহণ্য কোরিলাম এমণ । (গহন + অরণ্য)
তোবু ত পশুর সঙ্গে না হৈল দরশন ।। পৃ. ৬৮

খ) জিম্মা হৈল লহ ২ যুঝ ঘোরতর ।
দেখিতে ২ ঐরি আয়ে যম্বর ।। পৃ. ৯২ (অরি+ বৈরি) ।

গ) নিশুম্ভ বধিলে রণে ধনু র্বাণ নঞা ।
নিজ দাসে রক্ষা কর ঐরি মারিঞা ।। পৃ. ২৮৪

ঘ) উনমত্ত দেখো তোর বদন কমল
. বিকশিত দেখো পয়োভার । (পয়োধর + ভার)
মুক্তা জিনিঞা দেখো দশনের মুতি
চামর জিনিয়া কেশভার ।। পৃ. ৮১

আঞ্চলিক বিশেষত্ব :-

(১) [illegible] শব্দের আদিতে 'র' ধ্বনি আগম / লোপ :-

ক) অরে বেটা রামানন্দ বাপের রস্থি খাইস । (রস্থি = রস্হ = অস্হ)
আপনে থাকিতে কেন পাইকেক যুঝাস ।।পৃ.১২৫ ।

খ) রাইহ অতেক আইল দিভা দেখিবারে । পৃ. ৪৭
(রাইহ = আইহ = ও , ই , হ , আ = অবিধবা)

গ) ইন্দ্রের ঘোরনি মাতা নাম শচিরাই ।
তার তরে কৃপা কৈল মঙ্গল চণ্ডিরাই ।। পৃ. ৪৪
(রাই = আই = আজি = অজ্জিআ = আর্যিকা ।)

ঘ) রান্ধ = আন্ধ , ঙ) রাঢ় = আঢ় , প্রভৃতি ।

সকল অর্থে 'সভা' শব্দের প্রয়োগ :-

ক) রাজ আজ্ঞা পাঞা প্রজা করিল গমন ।
দেহরা পুজিতে সভে হইল একমন ।। পৃ. ২৮

খ) ইন্ট মিত্র বন্ধু আইল সভাকে বসিতে দিল
তিমচের বাদ্যে লোক হাসে ।। পৃ. ৫৬

ধনবান্ অর্থে 'ধনিন' শব্দের প্রয়োগ :-

ক) বেঘ্রের বেহু নথ ধনিনে কিনিঞা লয়
যোবনে ঘুড়িয়া দেয় গলে । পৃ. ৫৮

খ) নিত্য ২ ভবানীর পদে মাগে এহি বর ।
যোরে বিবাহXX হয় জেন ধনিনের ঘর ।। পৃ. ১৫৬

বাক্যালঙ্কার অর্থে 'সে' শব্দের প্রয়োগ :-

ক) ধর বলি ফুলু পান মোর থাবে ।
আম্বানি পাণ্ডা ভাত বাড়িআ সে দিবে ।। পৃ. ৬৫

খ) শ্রীমন্ত বলেন রাজা করি নিবেদন ।
এবেসে হইল আমার প্রতিজ্ঞা পূরণ ।। পৃ. ৩০৫

কতকগুলি শব্দে মহাপ্রাণতার অস্তিত্ব :- যেমন- বাঢ়ে, বাঢ়াইয়া, পঢ়ে, পঢ়িয়া প্রভৃতি

ক) বায় অঙ্গ নারায়ণী দিলেন বাঢ়াইয়া ।
রহিল অর্দ্ধেক নবাণ তাহাতে বাজিয়া ।। পৃ. ৬৭

খ) দুর্গা বলে কালকেতু কহিব তোমারে ।
নিজপতি কথা কৈতে হৃদয়ে শান বাঢ়ে ।। পৃ. ৯০

গ) রুক্মিনী চলিয়া জায়ে কাচুলি পঢ়িয়া গায়ে
খোপা ভরি পঢ়ে চাঁপার ফুল ।
ব্রহ্মা বাণিয়ানী নড়ে হাসিতে মানিক পড়ে
জার রূপ দেব সমতুল ।। পৃ. ১৭৭

দৃঢ় শব্দজাত 'দিঢ়', 'দড়' শব্দের প্রয়োগ বিভিন্ন অর্থে এই কাব্যমধ্যে পরিলক্ষিত হয় । যেমন - দিঢ় করি, দড়াইয়া প্রভৃতি :-

ক) শিবের সাক্ষাতে দুর্গা বচন দড়াইয়া ।
কর্দ্দমুনির জীব রইল আচলে বান্ধিয়া ।। পৃ. ১৫৫

খ) একদিন অনুরঞ্জন দিঢ় করি রান্ধি ।
মারয়ে পীড়ার বাড়ি কোনে বসি কান্দি ।। পৃ. ১৭২

গ) কুন ২ যাড় আইল হিয়া করি দিঢ় ।
কুন ২ যাড় আইল বোচা কুম্ভীর ।। পৃ. ১৭৩

দ্বিস্বর 'উ' এর প্রাসঙ্গিক রূপ - যেমন :- গৌরী = গউরী । পৃ.-৭ ।
গৌড় = গউড় । পৃ.-২০৭ ।

গৌরবে মধ্যমপুরুষের 'আপনি' শব্দের প্রয়োগ এই গ্রন্থে কোথাও নাই। যে প্রয়োগগুলি পাওয়া গিয়াছে তাহা সবই 'নিজ' অর্থে। যেমন :- 'আপনে ধর্ম গোসাঞি সত্যরূপ হৈল।' পৃ.-২

গ্রন্থকারের সন্ধানে -

বাংলা সাহিত্যে কবি মানিকদত্তের অবস্থা প্রায় সংস্কৃত সাহিত্যের কবি কালিদাসের মত। নামটি ছাড়া আর বিশেষ কিছু তাঁহার সম্পর্কে ঠিকভাবে জানা যায় নাই। কাব্যের আভ্যন্তর প্রমাণেও তাঁহার সম্পর্কে খুব একটা স্পষ্ট ধারণা গড়িয়া উঠেনা। তথাপি কাব্যের নানা স্থানে নানা উপলক্ষে কবি বিভিন্ন স্থানের নাম এবং ক্ষেত্রবিশেষে সেই নামগুলির যে বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন সেইগুলিকে ভিত্তি করিয়া তাঁহার কাল সম্পর্কে কোন্ ধারণা আভাষিত হইয়া উঠে তাহা আলোচনা করিয়া দেখা চলে এবং সেই সাথে বিভিন্ন সময়ে নানা সুধীজন ও পণ্ডিতব্যক্তি তাঁহার কাল সম্পর্কে বা কাব্য সম্পর্কে যে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন সেইগুলিও আলোচনা করিয়া দেখা যায়।

কাব্যমধ্যে কবির নিজের বাসস্থানের কথার উল্লেখ দুইবার পাইতেছি। প্রথমবারে গীতের পুঁথি প্রাপ্তির প্রাক্কালে পদ্মাদেবীর মুখে শোনা যায় তাঁহার বাড়ী 'ফুলফুল্যানগর', কিন্তু এই উল্লেখ কাব্যের অন্যতম উপবিভাগ 'বোলাম' অংশে পাইতেছি। 'বোলাম' অংশগুলি কবিরচিত কাব্যের অঙ্গীভূত কিনা তাহাতে আমাদের অবশ্য সংশয় আছে। এমনও হওয়া অসম্ভব নহে যে এই অংশগুলি গান গাহিবার সময় গায়ন নিজে রচনা করিয়া দিয়া কাহিনীর অসংলগ্নতাকে শ্রোতৃবর্গের নিকট ধারাবাহিকতায় উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেন অথবা শ্রোতৃবর্গকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়া তাহাদের কৌতূহল নিবারন করিতেন। দ্বিতীয়বারে কলিঙ্গরাজের নিকট আত্মপরিচয়দান কালে মানিকদত্ত বলিয়াছেন প্রফুল্লানগর। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই প্রফুল্লানগর বা ফুলফুল্যানগরের স্মৃতি আজ সম্পূর্নভাবে অবলুপ্ত। তাঁহার সম্পর্কে ইতঃপূর্ব্বে যাঁহারা কলম ধরিয়াছেন তাঁহারা অনুমান করিয়াছেন এই নগর বর্ত্তমান মালদহ জেলার কোন অঞ্চলে হওয়া সম্ভব এমনকি স্বাভাবিক। মালদহ জেলাটাই বৃটিশ আমলের সৃষ্টি - ইহার বিভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দিনাজপুর, রাজসাহী, ভাগলপুর, পূর্নিয়া প্রভৃতি প্রাচীণতর জেলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনা হইয়াছে। আবার স্বাধীনতার প্রাক্কালে এই জেলার কতক অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া তৎকালের পূর্ব্বপাকিস্থান - বর্ত্তমানের বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, রাজসাহী দিনাজপুরেরও একই অবস্থা। ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যাণ্ড বুক-এ বর্ত্তমান মালদহ জেলার কোন অংশে প্রফুল্লানগর বা ফুলফুল্যানগর* নামে কোন মৌজার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ফুলবাড়ী নামাঙ্কিত ৫।৬টি গ্রামে এবং মানিকপুর নামক একটি গ্রামে ঘুরিয়াও কোন ফলোদয় হয় নাই।

- -

* আমাদের সংগৃহীত পুঁথিগুলির অনুলিপিগুলি অবশ্য বর্ত্তমানে মালদহ জেলার উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলের (হবিবপুর-বামনগোলা থানা) গ্রামগুলি হইতে সংগৃহীত। সেই অঞ্চলেও বর্ত্তমানে একজনমাত্র চণ্ডী পালাগানের গায়ক বর্ত্তমান, আর কেহ এখন এই গান গায়না। এই গায়কের মাতামহ এককালে গান করিত, বৃদ্ধাবস্থায় গান গাওয়া আর তাহার পক্ষে সম্ভব হয়না। এই বৃদ্ধগায়ক যাহার নিকট পালাগুলি পাইয়াছিল তাহার মৃত্যু হইয়াছে বহুপূর্ব্বেই। তবে এই তিনপুরুষের তিনজন গায়কই উক্ত হবিবপুর থানার অধিবাসী। কিন্তু ঐসব অঞ্চলেও ঐ নামধেয় কোন মৌজা বর্ত্তমানে নাই।

দ্বিতীয়তঃ এই ফুলফুল্যাবাসী মানিকদত্ত নিজের পরিচয় দিয়াছেন - 'কানাখোঁড়া' বলিয়া, যদিও দেবীর কৃপায় এই উভয় দোষই তাঁহার দূর হইয়াছিল। তিনি একটি গানের দল গঠন করিয়া (৩।৪ জনের) গান গাহিতেন। তিনি কলিঙ্গদেশে গান গাহিতে যাইয়া কলিঙ্গরাজ কর্ত্তৃক আবদ্ধও হইয়াছিলেন এবং পরে চণ্ডীর কৃপায় মুক্তি পাইয়া গান গাহিয়া সকলের মন আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। পূর্ব্বতন কলিঙ্গরাজ সুরথের রাজ্য ভাঙ্গিয়াই কালকেতুর গুজরাট নগর গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহা আর যাহাই হউক পুরোপুরি ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া মানা যায়না। যেটুকু সত্য হওয়া সম্ভব তাহা হইল এই যে তিনি কোন ব্রতকথা দেখিয়া পালাগান রচনা করিয়া নিজেই একটি দল গড়িয়া লইয়া গান গাহিতেন। তাঁহার দলের দুই ~~ছেলের~~ ব্যক্তির নাম রঘু ও রাঘব -ইহারা হইয়াছিল সেই দলের 'পালি' বা 'দোহার'। এই দল লইয়াই তিনি কলিঙ্গদেশে গান গাহিতে গিয়াছিলেন। যে কলিঙ্গ দেশেরই পূর্ব্বতন রাজা সুরথের রাজ্য ভাঙ্গিয়া গুজরাট নগর গড়িয়া উঠিয়াছিল। কলিঙ্গরাজগণের নাম গণনা করিয়া দেখা যায় যে খৃঃ ১০০০ হইতে ১৫০০ খৃঃ মধ্যে সুরথ নামে কোন রাজা নাই।[১] খৃষ্টীয় ১০০০ এর পূর্ব্বে বাংলাভাষার তো উৎপত্তিই সকলে স্বীকার করেননা। ১৫০০ খৃঃ ধরার তাৎপর্য এই যে মানিকদত্তের আমল বাংলাদেশের ইতিহাসে মুসলমান আমল - তাঁহার কাব্যের ভাষায় বহু ইস্লামিক শব্দ আসন করিয়া লইয়াছে। ইহা বেশ কিছুকাল মুসলমান রাজত্বেরই ফল। উদাহরনস্বরূপ উল্লেখ করা যায় এই শব্দগুলি :- গোলাপ, উম্বর, বেপারিয়া, নফর, সফেদ, মোহরর, আরজিয়, আরোজ, তজবিজ, দরজী, মজিল, খরিদ্দার, জিঞ্জির, দলিচা, তলব, সফর, তকরার, আমা, সওয়ার প্রভৃতি। সুতরাং তিনি ১২০৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বের লোক হইতেই পারেননা বরং তাহার অন্ততঃ ১৫০ শত বৎসরের পরে তাঁহার বর্ত্তমান থাকাই স্বাভাবিক।

মানিকদত্ত অন্য যে স্থানগুলির নাম উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় কালকেতুর গুজরাট বা গুজরা র বা গুঞ্জরাত বন উড়িষ্যা দেশের কাছাকাছি ছিল, এইস্থান হইতে সমুদ্রও বেশী দূরে নয়। গুজরাটের কাছেই ছিল যমুনা নামে একটি নদী, এবং কংস নামে অপর একটি নদী। বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলের একটি অংশের নাম ছিল ধনিয়াডাঙ্গা, কালকেতুর শ্বশুরবাড়ী ছিল সমুদ্রের কাছেই বৈরাটনামক নগরে, নিকটবর্তী একটি বাজারের নাম ছিল শ্রীকলার বাজার।

ভাড়ুদত্তের গৃহ বন্যার জলে ভাসাইয়া ভাড়ুকে গুজরাটের অধিবাসী করার দেবীকৃত প্রচেষ্টায় মানিকদত্ত এই সকল নদীর নাম করিয়াছেন - পুনর্ভবা, বসুধারা, আত্রাই যমুনা, দামোদর, বেকাশ্বর, অজয় ও মসিনা। অবশ্য বাস্তবের ক্ষেত্রে এইসকল নদীর অনেকটির পক্ষেই কলিঙ্গনগরে উপস্থিতি সম্ভব নহে। কবি এইখানে তাঁহার পরিচিত নদীগুলির কয়েকটির নামই উল্লেখ করিয়াছেন বন্যার প্রকোপ দেখাইবার জন্য, নদীগুলির কলিঙ্গরাজ্যে গমন ব্যাপারটা একান্তই কল্পনারাজ্যের।

---

১. History of Orissa PP. - 193

কবির দৃষ্টিতে উজানী ইছানী নগর দুইটি ছিল পাশাপাশি - কবি বলিয়াছেন 'উজানী ইছানী চালে চালে ঘর।' x এই দুইটি নগরী ছিল ভোমরা নামক একটি ছোট নদীর তীরে অবস্থিত। উজানী হইতে গৌড়ে পিঞ্জর তৈয়ার করার যাত্রাপথে ধনপতির দোলা যে সকল স্থান অতিক্রম করিয়া যায় মানিকদত্ত তাহার কয়েকটির নাম করিয়াছেন - বনগ্রাম, সিমলানগর ও শীতলপুর। গৌড় ও উজানীর মধ্যবর্তী দূরত্ব চার 'মজিলের' পথ অর্থাৎ মোটামুটি চারদিনের পথ। উক্ত তিনটি স্থানের ভৌগোলিক অবস্থান নির্নয় করা বর্তমানে অসাধ্য। পুনরায় যখন ধনপতি নৌকাযোগে গৌড় হইতে উজানীতে ফিরিয়া আসেন তখনকার পথের পাশ্ববর্তী কয়েকটি স্থানের নামও মানিকদত্ত উল্লেখ করিয়াছেন যেমন - খোসবাজার, বিষ্ণুপুর, গৌড়ীগঙ্গা, বাহাদুরপুর, ব্রহ্মপুর, গণকর, ও উজানী। এই স্থানগুলির কয়েকটির পরিচয় এখনও পাওয়া যায়। খোসবাজার সম্ভবতঃ গৌড়ের বাইশবাজারেরই একটি হইবে, যে বাইশবাজারের নামের সাথে যবন হরিদাসের নাম জড়িত হইয়া রহিয়াছে (আনুমানিক ১৪০৮ খৃঃ)। বিষ্ণুপুর কোথায় ছিল তাহা ঠিক ধরা যায়না। গৌড়ীগঙ্গা খুবসম্ভব গৌড়ের পশ্চিমদিক দিয়া প্রবাহিত সুপ্রাচীন নদীটি। ইংলিশবাজার থানায় বাহাদুরপুর নামে একটি মৌজা এখনও আছে- উহা গৌড়ীগঙ্গার নিকটেই। গৌড়ীগঙ্গাকে বর্তমানে লোকে ভাগীরথীই বলিয়া থাকে। ব্রহ্মপুর বর্তমান বহরমপুর শহরেরই প্রাচীণ নাম*, গণকর এখনও আছে ঐনামেই, ইহা মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমায় অবস্থিত একটি রেলওয়ে স্টেশন। ইহার পরেই হইবে মানিকদত্তের উজানীনগর যাহা ভোমরা নদীর তীরে অবস্থিত। ধনপতির বিবাহে যে চাররাজ্যের নিমন্ত্রণ প্রেরণ করা হইল তাহা উজানী, ইছানী, মঙ্গলকোট ও অবন্তী। মঙ্গলকোট নামক একটি স্থান বর্ধমান জেলায় আজও বর্তমান এবং কবির দৃষ্টিতে উজানী ইছানীও খুব সম্ভব বর্ধমান জেলায়ই ছিল। রাজ্যগুলির পরিসরও খুবসম্ভব ছিল অল্প, ছোটখাট জমিদারী এলাকার মত। অবন্তী হয়তো কোন নিকটবর্তী অঞ্চলের নাম হইবে। কালিদাসের বা বাণভট্টের অবন্তী হইতেই পারেনা।

ধনপতি যখন উজানীরাজ বিক্রমকেশরের অনুরোধে আগরচন্দন আনার জন্য দক্ষিণ-পাটনে যায়, তখন উজানীর ভোমরানদীর ঘাট হইতেই তাহার যাত্রা আরম্ভ হয়। পথে ধনপতি নিম্নলিখিত স্থান ও নদী ক্রমানুয়ে পাছু করিয়া গিয়াছিলেন। যথা- শঙ্খনদী, ধুরাইচুরাই, গঙ্গাসুরেশ্বরী, আম্বুয়ার মুলুক, বোগাইচণ্ডী, কোদালিয়ার ঘাট, নদীয়া শান্তিপুর, ভীমঘাটা, কুমারপুর, মগরা, নগরইন্দ্রানী, সপ্তগ্রাম, - ইহার পরই নানা দহ অতিক্রম করিয়া সিংহলের রত্নমালার ঘাটে উপস্থিতি॥ পুনরায় শ্রীমন্ত যখন পিতার অন্বেষণে সিংহলের দিকে যাত্রা করে তখন তাহার পথে পড়ে এইস্থান ও নদীগুলি:- ভোমরার পরে শিবাইনদী, গোপ্তগঙ্গা, ভীমঘাটা- কুমারপুর, বগাইচণ্ডী, কোদালিয়ার ঘাট, হালিমশহর, ত্রিবেণী, গঙ্গাভাগীরথী, ইন্দ্রানী, কলিকলা, ধুরাইচুরাই, নদীয়া, সপ্তগ্রাম, গোপ্তপাড়া, গঙ্গাসুরেশ্বরী, আম্বুয়ামুলুক, মগরা - ইহার পরই নানা দহের উল্লেখ আছে।

* Murshidabad Dt. Gazetteer. – PP.-175

এই দুইটি যাত্রার মধ্যে কালের ব্যবধান মাত্র বার বৎসরের। উভয় তালিকার মধ্যে তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে নামগুলির মধ্যে পারম্পর্য্য সম্পর্কে কবি উদাসীন, উভয়েই যখন দক্ষিণ পাটন হইতে ফিরিয়া আসে তখনকার পথে বিপরীত ক্রমে পড়িতেছে মগরা, সেতুবন্ধগঙ্গা, অন্যান্য নদনদী, শঙ্খেশ্বরী-ভ্রমরা, উজানী। এই নদী ও স্থানগুলির নাম হয়তো কবির জানা ছিল - কিন্তু তাহাদের ভৌগোলিক সংস্থান সম্পর্কে তাঁহার খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল বলিয়া মনে হয়না। এই গুলির মধ্যে মধ্যযুগে আম্বুয়া মুলুক বিখ্যাত ছিল শ্রী চৈতন্য শাসিত কাজির শাসন অঞ্চল বলিয়া। ইন্দ্রানী নামে একটি পরগণা বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। নদীয়া শান্তিপুর, মগরা ও সপ্তগ্রামও মধ্যযুগের বিখ্যাত স্থান। অন্যান্য স্থানগুলি আধুনিক কালে আসিয়া নিজের প্রাধান্য হয়তো হারাইয়া ফেলিয়াছে। উপরিউক্ত স্থানগুলি ছাড়া অন্য প্রসঙ্গে যে স্থানগুলির নাম এই কাব্য মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা এই :- উড়িষ্যা, মুনিকট, কাশ্মাইর নাটশালা, বারানসী, গয়া প্রয়াগ, চাপালী প্রভৃতি। উজানীর নিকট যে বনে খুল্লনা ছাগল চড়াইত তাহার নাম দণ্ডকবন, ইহা আর যাহাই হউক - বিখ্যাত দণ্ডকারণ্য নহে। হয়তো বা ইহা কবির উদ্দাম কল্পনারই স্বাক্ষর বহন করে।

স্থানগুলির মধ্যে কবি সপ্তগ্রাম ও ইন্দ্রানীর বিশেষ পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আর গৌড়েরও কিছু পরিচয় দিয়াছেন। ধনপতি যখন গৌড়ে যান তখন গৌড়ের রাজা ছিলেন ধনেশ্বর। ইহাকেও ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলার মত উপকরণ আমাদের হাতে নাই। সেইস্থানে নাটগীতের চর্চা হইত, সোনার পিঞ্জর তৈয়ার করারযোগ্য কারিগরও সেখানে ছিল এবং হয়তো স্বর্ণকাররূপে তাহাদের খ্যাতিও ছিল। তাহা ছাড়া গৌড় ছিল তৎকালে শ্বাপদসঙ্কুল, খুল্লনা স্বামীর প্রত্যাবর্তনে দেরী হইতেছে দেখিয়া আশঙ্কা করিয়াছিল তবে কি তাহার স্বামীকে গৌড়ের বাঘে খাইয়া ফেলিল? সম্ভবতঃ প্রথম হইতেই এই অঞ্চলটি জঙ্গলাকীর্ণই ছিল, অথবা মুসলমান আমলে জালালুদ্দীনের সময়ের পূর্ববর্তী ন্যূনাধিক ৭০ বৎসর কাল রাজধানী গৌড়ে ছিলনা - ছিল পাণ্ডুয়াতে। এই সময়েও উহা কিছুটা জঙ্গলাকীর্ন হইয়া উঠা অসম্ভব নহে। উজানীর বণিকদের যে ব্যবসাবাণিজ্য উপলক্ষে গৌড়ে যাতায়াত ছিল তাহার আভাষ পাওয়া যায় খুল্লনার উক্তিতে। যথা- জে জে সাধু গাছে গেল সেই আল্য আগে।

আমার স্বামীকে বুঝি খাল্য গৌড়ের বাঘে।

(পৃ. ২০৪)।

ইন্দ্রানীর যে বিবরণ শ্রীমন্তের মুখে পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় কোন্ এক শাহ উপাধিধারী রাজা সেখানে গঙ্গায় পাথর দিয়া ঘাট বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে বারুণী উপলক্ষে বহু লোকের সমাগম হইত। পুন্যাত্মা ব্যক্তিরা সর্ব্বদাই সেই ঘাটে স্নান তর্পন করিতেন। স্থানটি একটি বানিজ্যকেন্দ্রও ছিল। বিভিন্নস্থান হইতে নৌকাযোগে এইস্থানে পণ্য আনা নেওয়া হইত। পন্যগুলির মধ্যে একটি ছিল উড়িষ্যার পাথর অপরটি ছিল হরিপালের গুয়া। স্থানটি বেশ প্রাচীন।

সপ্তগ্রামে শ্রীমন্ত দুর্গার মঠে '' মেড় '' ঘরে পূজা করেন । ছাগ - মহিষ বলি দিয়া চণ্ডীর তুষ্টি বিধান করেন । এই সপ্তগ্রামে বণিকদের বসতি ছিল বিস্তর । ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধের আমন্ত্রণে যে সকল স্থানের বণিকরা যোগ দেয় তাহাদের মধ্যে সপ্তগ্রাম , ইছানী , চাপালী ও দিল্লীপের বাণিয়ারাও ছিল । দিল্লীপ বর্ত্তমান দিল্লী , সেস্থান বহুদূরে সুতরাং সেখানে নিমন্ত্রণ পাঠান সম্ভব নয় । মনে হয় এককালের প্রধাণ বানিজ্যকেন্দ্র সপ্তগ্রামেই কিছু সংখ্যক দিল্লীপের বাণিয়ারও বসতি ছিল ।

শ্রীমন্তের পিতাকে উদ্ধারের জন্য যাত্রাপথে মানিকদত্ত নদীয়ার নাম করিয়াছেন । কিন্তু সে নদীয়ার যে বিবরণ পুঁথিমধ্যে পাইতেছি তাহা কালানুক্রমিকতার দিক হইতে সংশয়জনক । নদীয়া সম্পর্কে এই বিবরণটুকু পাওয়া যায় :-

ধন্য ধন্য পুন্য করে শচী ঠাকুরানী ।
যাহার শতেক নাম পুরাণে বাখানি ।।

অপূর্ব্ব দেখিলাম দেশ বড় পুন্যবাণ ।
গৌরচন্দ্র জানিলাম সাক্ষাতে ভগবান ।। পৃ. ২৫৮ ।

এই অংশটি পরবর্ত্তীকালের প্রক্ষেপ বলিয়া মনে হয় । কারণ যাঁহার চরিত্র পুরাণে বাখানে এবং যিনি স্বয়ং ভগবান গৌরচন্দ্র তাঁহার সম্পর্কে ধনপতির যাত্রায় মানিকদত্তের সম্পূর্ন নীরবতা অবলম্বন করার কথা নয় । তর্কের খাতিরে যদি ধরিয়া লই যে মানিকদত্ত ইহা জানিতেন তাহা হইলে প্রশ্ন জাগে কোন্ পুরাণের কাহিনীতে শচীঠাকুরানী প্রশংসিত হইয়াছেন । ইহার উত্তর খুব সম্ভব বৃন্দাবনদাস রচিত চৈতন্যভাগবত । তাহা হইলে মানিকদত্তের কাল ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতে পারে । তাহা ছাড়া মানিকদত্তের আমলে তাহার ব্যবহৃত বাংলা ভাষার যে ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট তাহা মোটামুটিভাবে চৈতন্যভাগবতের ভাষার অনুরূপ বলা চলে । উদ্ধৃত অংশটিকে যদি আমরা প্রক্ষিপ্ত বলিয়াও ধরি তথাপি ভাষা বৈশিষ্টের সামর্থ্যবলে মানিকদত্তকে ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের কোন স্থলে স্থান দিতে হয় । তাহা হইলে একদিকে নিম্নতমসীমা মুকুন্দরাম কর্ত্তৃক কৃতজ্ঞচিত্তে মানিকদত্তের স্বীকৃতি* অপরদিকে উর্দ্ধতমসীমা বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের নিম্ন পংক্তিগুলি :-

ধর্ম্মকর্ম্ম লোক সভে এইমাত্র জানে ।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে ।।

এই মঙ্গলচণ্ডীরগীত আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞানপরিধির মধ্যে কাহারও জানা নাম কোথাও কেহ উল্লেখ করেন নাই । আমরা যদি এখানকার অনুল্লিখিত লেখককে মানিকদত্ত বলিয়া আপাততঃ মানিয়া লইতে পারি তবে মনে হয় তাঁহার উপর দিয়া যে অনিশ্চয়তা ও সন্দেহের স্রোত চলিতেছে তাহার সাময়িক অবসান হইতে পারে । মানিকদত্ত যদি মঙ্গলচণ্ডীর গীতে প্রাধাণ্যই না পাইতেন তবে -

---

* মানিকদত্তেরে আমি করিয়ে বিনয় ।
যাহা হৈতে হৈল গীতপথ পরিচয় ।। ([illegible] সং — পৃঃ ৮)

মুকুন্দরামের মত শিক্ষা সংস্কৃতি সম্পন্ন কবির পক্ষে কৃতজ্ঞতার সুরে মানিকদত্তের উল্লেখ হইত কিনা সন্দেহ।

" নিরবধি নৃত্যগীত বাদ্য কোলাহল।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরমমঙ্গল ।। "

পরমমঙ্গল কৃষ্ণনাম না শুনিয়া তখনকার লোকে ব্যবহারিক মঙ্গলচণ্ডীর গানই শুনিত। এই দিক হইতে দেখিতে গেলে মানিকদত্তকে ষোড়শ-শতাব্দীর প্রথমভাগে স্থান দেওয়া চলে সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। তাছাড়া মঙ্গলচণ্ডীর 'পালাগান' ছাড়া রাত্রি জাগরন সম্ভব নয়, নবদ্বীপের লোক যে-গীতে রাত্রি জাগরন করিত তাহা খুব সম্ভব পালাগান অবলম্বনেই বাস্তবে প্রচলিত ছিল। আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলা চলে নবদ্বীপের অবস্থার যে বর্ণনায় উক্ত পংক্তিগুলি রচিত সে নবদ্বীপ নিশ্চয়ই শ্রীচৈতন্যের জন্মকালের নবদ্বীপ। তাহা হইলে অবস্থা আরও পরিবর্তিত হইয়া এমন দাঁড়াইতে পারে যে - চৈতন্যের জন্মকালে অর্থাৎ ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই মানিকদত্তের গান মালদহ অঞ্চল হইতে স্বকীয়গুণেই ঐ সম্প্রসারিত হইয়া চৈতন্যজন্মকালে নবদ্বীপ অঞ্চলে প্রচারিত ছিল। তাহা হইতে অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসর নিশ্চয়ই লাগিয়াছে এবং ইহা স্বীকার করিলে মানিকদত্তকে পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদেও স্থান দেওয়া চলে। ইহার বিরুদ্ধে বলার মত দুর্বল উপাদান বা যুক্তি দুইটি হইতে পারে - প্রথমতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবতার ছাপ। ইহা আমরা নিরসন করিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ ভাষা - যে ভাষাভিত্তিক উপাদানকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিলে চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাসকেই কি ইতিহাসের স্বস্থানে ধরিয়া রাখা যায়? তাহা যখন যায়না তখন সে যুক্তিও চলেনা। ষোড়শ শতাব্দীর চৈতন্য ভাগবতের উপর যতটা সংস্কৃত ভাষার প্রভাব পড়িয়াছে, মানিকদত্তে ততটা লক্ষিত হয়না। চৈতন্য-ভাগবতকার নবদ্বীপ বুঝাইতে প্রাচীনতর নাম 'নদীয়াঁ' ও অর্বাচীন পুনঃ সংস্কৃতায়িত নাম নবদ্বীপ উভয়ই ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু মানিকদত্তে পাই শুধু নদীয়া। মুস্লিম ঐতিহাসিকদের লেখায়ও 'নুদীয়া'ই পাওয়া যায় - নবদ্বীপ নহে। ইহা হইতে মনে হয় মানিকদত্ত বৃন্দাবন দাসের পূর্ববর্তী। যদিও একথা ঠিক যে অন্যদিক হইতে সমর্থন না পাওয়া পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরা চলেনা।

মানিকদত্তের ভাষায় যে আঞ্চলিক শব্দগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা সাধারণতঃ মালদহ জেলা, পশ্চিমদিনাজপুর জেলার দক্ষিণপশ্চিম অংশ এবং বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার পশ্চিমাংশে প্রচলিত। এই প্রসঙ্গে গায়নদের হস্তক্ষেপের একটি উদাহরন দিতেছি। দেবীর পশুগণের বরদান প্রসঙ্গে আমাদের পুঁথিতে 'হারাম' শব্দটি একবার উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই শব্দটিকে আঞ্চলিক বলিতে আমরা প্রস্তুত নহি। কারণ শব্দটির ব্যবহার শুধুমাত্র মুস্লিম সমাজেই প্রচলিত এবং তাহা অন্যান্য অঞ্চলের মুস্লিম সমাজেও রহিয়াছে

আমাদের মনে হয় 'শূকর' শব্দের স্থলে 'হারাম' শব্দের ব্যবহার করিয়া কোন গায়েন মুসলিমপ্রধান শ্রোতৃবর্গের সন্তোষ বিধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। আভ্যন্তর প্রমাণে ইহা অবশ্য সত্য বলিয়া মনে হয়, মানিকদত্ত যে সমাজ পরিবেশে কাব্যটি রচনা করিয়াছিলেন সে সমাজে মুসলমান রাজত্বের ফলে বিশেষতঃ রাজধানী গৌড়ের নিকটবর্তী অঞ্চলে বসবাস হেতু প্রচুর পরিমাণে ইসলামিক শব্দের ব্যবহার ঘটিয়াছে। এতৎসত্ত্বেও 'শূকর' অর্থে হারাম শব্দের প্রয়োগ গৌড়ের পার্শ্ববর্তী হিন্দু সমাজে মোটেই প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়না।

এই জাতীয় প্রক্ষেপ যে গীতপুঁথিতে থাকা খুবই সম্ভব এবং স্বাভাবিক তাহা শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয় তৎকর্তৃক সম্পাদিত মনসাবিজয় কাব্যের ভূমিকার পঞ্চম পৃষ্ঠার প্রারম্ভে তৃতীয় হইতে একাদশ পংক্তির মধ্যে বিবৃত করিয়াছেন।*

মানিকদত্তের কাল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে 'রহিলা' প্রসঙ্গও একেবারে বাদ দেওয়া চলেনা। অবশ্য রহিলাদের সম্পর্কে আমরা সাধারণভাবে পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। ১৭৭২ এ হেস্টিংস ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহন করার পরে রহিলাদের নাম খুব বিখ্যাত হইয়া যায়। কিন্তু তৎপূর্বেও দিল্লীর পার্শ্ববর্তী একটি রাষ্ট্র হিসাবে 'রোহিলখণ্ডের' নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে। তাহা ছাড়া ভারতচন্দ্র যখন ১৭৫২ খৃঃ তাঁহার কাব্য অন্নদামঙ্গল সমাপ্ত করেন তখনও রোহিলারা যুদ্ধবিদ্যায় নিশ্চয়ই পারদর্শী হিসাবে খ্যাত ছিল। যাহার প্রমাণ অন্নদামঙ্গলেই পাই। যথা :- উজবক কজলবাসে ঘেরিয়াছে চারিপাশে

রোহেলা জল্হাদ আদি যত ।।

ইতিহাসের ভিত্তিতেই আমাদের ধারণা যে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই রোহিলখণ্ডের অধিবাসীরা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে আসন করিয়া লইয়াছে। সুতরাং মানিকদত্ত যখনই কাব্য লিখুননা কেন, বাংলায় তাহাদের সৈনিক হিসাবে আগমন কোনক্রমেই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়না।

মানিকদত্ত যে চণ্ডীকে আশ্রয় করিয়া গীতপুঁথি রচনা করিয়াছেন, সে চণ্ডী এই অঞ্চলটিতে একসময়ে বিশেষ প্রাধান্য পাইয়াছিলেন এবং সেইজন্যই এই অঞ্চলটিকে একসময়ে বাইশচণ্ডীর থান বলিয়া উল্লেখ করা হইত বলিয়া এখনও শোনা যায়। সুতরাং আপাততঃ একথা স্বীকার করা চলে যে উক্ত অঞ্চলেরই কোন স্থানে মানিকদত্ত জীবনযাপন করিয়াছিলেন এবং তাহাও কোন পাঠান নবাবের আমলে হওয়া খুব সম্ভবপর। অবশ্য এই চণ্ডীপ্রাধান্য হিন্দু আমল হইতেই ধারাবাহিকভাবে চলিয়া আসিতেছিল। গৌড়রাজ লক্ষণসেনের সভার অন্যতম পণ্ডিত হলায়ুধ তাঁহার ব্রাহ্মণসর্বস্বে এই পূজার একটি মন্ত্রের ব্যাখ্যা দিয়াছেন এবং-

* "An obvious interpolation is the mention of Khardaha (now Khardah) as a "holy Seat" (Sripata). Such pre-eminence of the place dates from the middle of the Sixteenth Century when Nityananda Settled down here. In this connection Kalikata (Calcutta) also is mentioned, But this portion, narrating Cando's journey downstream from Saptagrama, is not repeated when Cando recounts in detail his voyage from home to Patna. There is a little doubt that the earlier narrative (ix 4) is a Singer's elaboration made at a much later date."

এই ব্যাখ্যার পরে বলিয়াছেন - 'অনেন মন্ত্রেণ সৌভাগ্যকামনায় স্ত্রিয়া ভগবতী - পূজাতে।' ইহা হইতে যে একটি বিষয় প্রকট হইয়া উঠে তাহা হইতেছে এই যে হিন্দু আমলে এই চণ্ডীপূজা বেশ ব্যাপকতা লাভ করিয়াছিল, এমনকি স্ত্রী - লোকেরাও এই দেবীর পূজা বা ব্রত করিত। আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলা যায়, - বাংলাদেশে প্রচলিত দুর্গাপূজাপদ্ধতির মধ্যে এই বিশেষ মন্ত্রটিকেও স্থান দেওয়া হইয়াছে।

হরিদাস পালিত, রজনীকান্ত চক্রবর্তী, ভবেন্দ্র চৌধুরী মহাশয়গণ তাঁহাদের প্রবন্ধে মানিকদত্তের স্থান সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহার সহিত একমত হইতে পারি আমরা আমাদের প্রাপ্ত পুঁথিতে মালদহে প্রচলিত আঞ্চলিক শব্দগুলির ভিত্তিতে।[১] যতদিন না ভিন্নতর এবং বিশ্বাসযোগ্য উপযুক্ত প্রমাণ সম্বলিত পুঁথি আবিষ্কার বা আমাদের হস্তগত হইতেছে।

পূর্বে যে বাইশচণ্ডীর থান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার পাঁচটির বিবরণ আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। অন্যান্যগুলির অনেকটিই এখন বাংলাদেশের অন্তর্গত। ইহার অন্যতম হইল দ্বারবাসিনী চণ্ডী। এই দ্বারবাসিনীর উল্লেখ মানিকদত্ত তাঁহার কাব্যমধ্যে করিয়াছেন। এই চণ্ডী যে ধ্যানে পূজিতা হন তাহা উক্ত চণ্ডীর পুরুষানুক্রমে পূজকের নিকট এইরূপ পাইয়াছি :-

শবারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বরপ্রদাম্।
হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপাল কর্ত্তৃকা করাম্ ।।
মুক্তকেশীং লোলজিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ ।
চতুর্বাহু সমাযুক্তাং বরাভয়করাং স্মরেৎ ।।

অপরটি হইতেছে দিনাজপুর জেলার ভাইওরে (ভাত্রৈর) অবস্থিত অষ্টাদশভুজা প্রস্তরনির্মিত চণ্ডী। ডঃ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের[২] বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে যে অষ্টাদশভুজা চণ্ডীমূর্তির কথা উল্লেখিত আছে তাহা পর্বতগাত্রে খোদিত। অষ্টাদশভুজা চণ্ডীর যে মূর্তি ভাত্রৈরে দেখা গিয়াছে তাহার বিবরণ নিম্নরূপ। -

আনুমানিক ৬'x৪x৩' একটি প্রস্তরখণ্ড খোদাই করিয়া এই অষ্টাদশভুজা যুদ্ধপরায়ণা উগ্রা দেবীমূর্তি তৈয়ারী করা হইয়াছিল। দেবীর দুইপায়ের মধ্যবর্তী স্থানে একটি শব শায়িত এবং তাহার নিকটেই একটি মহিষ ও যুদ্ধরত অসুর। মূর্তিটি বর্তমানে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় পরস্পর হইতে ১৫ হইতে ২০ ফুট দূরে অবস্থিত দেখিয়াছি। বৈশাখমাসে শনিমঙ্গলবারে সারামাস ধরিয়া দুইখণ্ডেই পূজা হয়। মূর্তিটির নাম ঘণ্টেশ্বরী চণ্ডী।[৩]

---

১. শব্দার্থ-টীকা (পৃ.-৩৭৮) অংশে 'মালদহ অঞ্চলে প্রচলিত শব্দবিশেষ' দ্রষ্টব্য।
২. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, চতুর্থ সং. পৃ.৪১২।
৩. উত্তরবঙ্গবিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শ্রী তরনীকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয়ের গবেষণামূলক ভ্রমণ রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত।

এইখানে উল্লেখ্য যে এই অঞ্চলেরই 'জহরাচণ্ডী ' যাহা বর্তমানে জহরাকালী বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে তাহাও বৈশাখ মাসেই শনিমঙ্গলবারে পূজিত হয়। শহরের নিকটবর্তী এইস্থানটিতে কোন দেবী মূর্তি নাই, আছে মাত্র একটি মুখোশ। এই শহরেরই বুলবুলচণ্ডী নামক গ্রামে যে মূর্তিটি আছে তাহা প্রস্তরনির্মিত শিশুসহ শায়িত একটি মাতৃমূর্তি। এইখানেও যথারীতি অন্যান্য চণ্ডীর ন্যায় বৈশাখমাসে পূজা হয়। এই সব ছাড়া যে চণ্ডীমূর্তি বা কালীমূর্তিটি অনাদৃত অবস্থায় গৌড়নগরীর মধ্যে পরিত্যক্ত হইয়া পড়িয়া আছে তাহা চারি-হস্ত বিশিষ্ট, নিম্নে শব শায়িত, জ্যৈষ্ঠমাসে রামকেলী মেলা চলাকালীন এই দেবী দর্শকমণ্ডলীর নিকট হইতে সামান্য পূজা পাইয়া থাকেন। অন্য সময়টা তাঁহাকে অনাদৃত অবস্থাতেই থাকিতে হয়। এই পাঁচচণ্ডী উপরিউক্ত বাইশচণ্ডীরই অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব। তবে গৌড়েশ্বরীর যে বিবরণ বুকানন সাহেবের রিপোর্ট তথা খান্ সাহেব আবেদ আলির গ্রন্থে আমরা পাই তাহা বর্তমানে নিশ্চিহ্ন। আশ্চর্য্যের বিষয় বর্তমানে গৌড়ের গড়ের মধ্যে যে গৌড়েশ্বরী বলিয়া কথিত মূর্তিটি দেখা গেল, তাহার উল্লেখ বুকানন, কানিংহাম বা আবেদ আলি উল্লেখ করেন নাই এর উল্লেখ আছে মালদা ডিস্ট্রিক্ট হ্যাণ্ডবুক-এ, যাহা ১৯৫০ এর পরের। ইহা কি তবে পরবর্তীকালে মাটির তলা হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিতেছে - বৃষ্টিবাদলে মৃত্তিকা অপসারনের ফলে? এই মূর্তিটির অনুরূপ একটি মূর্তির ভগ্নাবশেষ নয়রিয়া ফুলবাড়িয়া গ্রামে দেখা গিয়াছে। ঐ অঞ্চলের লোকেরা উহাকে গৌড়েশ্বরী চণ্ডী বলে।

এইবারে আরও একটি বিষয় আলোচনা করিতে হয়, তাহা হইল মানিকদত্তের উপরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবতার প্রভাব। আমরা এই পর্য্যন্ত যাহা বলিয়াছি তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে আমাদের প্রাপ্ত পালার পুঁথিগুলিকে ভিত্তি করিলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবতার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না। কিন্তু তথাপি প্রসঙ্গটি এই কারণেই উল্লেখ্য যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার এবং মঙ্গলকাব্যের ইতি-হাসকার মানিকদত্তের উপরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবতার প্রভাব প্রচুর পরিমানে লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত খুব সম্ভব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি আশ্রিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথির পাঠ সম্পর্কে আমরা নির্ভরযোগ্য ধারণা পোষণ করিতে পারিনা বিশেষতঃ আমাদের প্রাপ্ত পুঁথিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিতে -

''চৈতন্য অবতার লিখে সৈন্ন্যাসীর গণ।
ছয় গোসাঞি লিখিয়া লইল ততক্ষণ।। (পু.পৃ. ৪৮।২)

দেবীর কাচুলী নির্মাণ উপলক্ষে এই বিবরণ পাই। আমাদের কাহিনীর এই অংশে চৈতন্যঅবতারের কোন প্রসঙ্গই নাই এবং এই অংশের যে পুঁথি আমাদের অবলম্বন তাহা ১১৯২ সালে অনুলিখিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত পুঁথিখানা (৬১৮৫নং) ডঃ শ্রীঅসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ১১৯১ সা অনুলিখিত। এই পুঁথিতেই আরও নানা স্থানে চৈতন্যপ্রসঙ্গ প্রক্ষিপ্ত হইয়া আছে -

এবং ইহা যে প্রক্ষিপ্ত এবং একান্তই অপ্রাসঙ্গিক তাহার অন্যতম প্রমাণ এই, কলিঙ্গের মণ্ডলদিগকে দেবীর স্বপ্ন দেখানোর পরেই পাই :-

আজি সপন দেখায়া গেল চারিমণ্ডলগণ।
সত্বরে ছাড়িয়া চল গুজরাট ভুবন।।
গুজরাট নগরে দুর্গা করিব শাসন।
রচিল মানিকদত্ত ভবানী স্মরণ।।

পাচালী -

কথা হৈতে আইলে নগর বিনোদিয়া।
প্রেমে রসে ভাসাইল সকল নদিয়া।।
রাম রাম প্রভু রাম জীবের জিবন।
মোরে কৃপা কর প্রভু মুক্তি লৈলো সরণ।।
জয় জয় শ্রী চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ।।

ক্ষেণেক কৃষ্ণের পদে অভিলাস হয়।
ক্ষয় জায় সর্ব্বপাপ জগন্নাথ সুতে কয়।।
যুভয় প্রসন্নে দেবির দাসে গায়।
ভক্তজনেক দুর্গা হবে বরদায়।। (পুঃ পৃঃ ৬০।২ হইতে ৬২।২)।

সর্ব্বমোট এই ১৩৪ লাইনের শ্রী চৈতন্য ও তাঁহার সম্প্রদায়ের কাহিনী বিবৃত করিয়া ভক্তহৃদয়ের উৎসারের সহিত মানিকদত্তের কোন সম্পর্ক নাই বলিয়াই আমাদের ধারণা এবং এই ধারণার মূলে আমাদের সংগৃহীত মানিকদত্তের পুঁথিগুলি। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পুঁথিতে বিশৃঙ্খলার কথাও উল্লেখ করিয়াছেন, এ বিষয়ে আমাদের কোন দ্বিমত নাই। কারণ পুঁথিটির পাঠে কাহিনীর অসংলগ্নতা যে কোন পাঠকের কাছেই প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হইবে। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় অপর একখানি মানিকদত্তের পুঁথির নাম করিয়াছেন[১] এবং তাহা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালার (পুঃ সংখ্যা ২০৮) পুঁথি বলিয়াছেন। কিন্তু আমরা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ২০৮ সংখ্যক পুঁথি খুলিয়া দেখিয়াছি, দুর্ভাগ্যবশতঃ সে পুঁথিখানির নাম 'চৈতন্যমঙ্গল' চণ্ডীমঙ্গল নহে। ইহার পরেই আমরা অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয়ের গ্রন্থের[২] ৪১৬পৃঃ ফুটনোটে স ২০৮ খণ্ডিত একখানি পুঁথির সন্ধান পাইতেছি কিন্তু স২০৮ সম্পর্কে অধ্যাপক সেন মহাশয়ের গ্রন্থে এইটির বিবরণ যতদূর জানি ইহা বর্ধমান সাহিত্য সভায় রক্ষিত মানিকদত্তের পুঁথির একটিমাত্র পাতা। অপরপক্ষে বলা যায় যে- বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল পুঁথি রহিয়াছে মোট তিনটি। তাহাদের সংখ্যা যথাক্রমে ২৭৩৫, ২৭৩৬ ও ২৭৩৭। পুঁথি তিনটিই খণ্ডিত। পুঁথিগুলির পত্রসংখ্যা ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইতিপূর্বেই 'পুঁথিপরিচয়' অংশে লিপিবদ্ধ করিয়াছি

----

১. - বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ - ১৩১।
২. - বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড - পূর্বার্ধ, চতুর্থ সংস্করণ।

এই তিনটি পুঁথির উল্লেখ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ও অন্যান্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও পাইতেছিনা। ডঃ ভট্টাচার্য্য প্রণীত মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসেও মানিকদত্ত অংশের ভিত্তি একখানি মাত্র হস্তলিখিত পুঁথি এবং তাহাও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩১৮৫ সংখ্যক পুঁথিখানি। সুতরাং তাঁহারা সকলেই যে মানিকদত্ত সম্পর্কিত আলোচনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিকেই ভিত্তি করিয়াছেন তাহা বলাই বাহুল্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথির প্রকৃতি আমরা পূর্ব্বেই নির্ণয় করিয়াছি এবং সেইজন্যই মানিকদত্তের পুঁথিতে চৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের কোন প্রভাব আমরা স্বীকার করিতে পারিতেছিনা যেহেতু আমাদের প্রাপ্ত পুঁথি ও পালাগুলিতে ইহা নাই। দুই একটি জায়গায় কয়েক লাইনে যাহা পাইতেছি তাহাও প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই আমাদের ধারণা।

যে তিনজন গ্রন্থকার (ডঃ সেন, অঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ ভট্টাচার্য্য) মানিকদত্ত সম্পর্কিত বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথির দৃষ্টিভঙ্গিতেই মানিকদত্তকে চৈতন্য প্রভাবিত বলিতেছেন এবং সেইহেতুই তাহাকে চৈতন্যের অনেক পরে স্থান দিয়াছেন। আমাদের প্রাপ্ত পুঁথিতে ফিরিঙ্গি বা হারমাদ শব্দের কোন উল্লেখ আমরা পাইনা সুতরাং সেইকারণেও তাঁহাকে মুকুন্দরামের পূর্ব্ববর্ত্তী বলায় অসংলগ্নতা থাকেনা। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভাষার আধুনিকতার ভিত্তিতেও মানিকদত্তকে মুকুন্দরামের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। কিন্তু একথা তো সকলেরই জানা যে লিপিকর ও গায়নদের হাতে মূল কবির ভাষা পুরুতরভাবে রূপান্তরিত হইয়া যায়। এইক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। চণ্ডীদাস এবং কৃত্তিবাসের ভাষাকে আমরা পাইয়াছি কি? আর যে ভাষায় পাইয়াছি তাহার ভিত্তিতে কি তাঁহাদের কাল নির্ণয় হইয়াছে বা নির্ণয় করা চলে?

স্থলবিশেষে বর্ণনার সাম্য লক্ষ্য করিয়া অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়াছেন মুকুন্দরামের অনুকরণেই মানিকদত্তের নামে পরবর্ত্তীকালে কোন কবিকর্ত্তৃক ইহা রচিত, কিন্তু যেখানে মানিকদত্তের কালই সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নাই সেখানে বিপরীতভাবেও তো বলা চলে যে নির্ধারিত তারিখের কবি মুকুন্দরাম তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কিন্তু অনির্ণীত তারিখের কবি মানিকদত্তের রচনাকে অবলম্বন করিয়া তাহাকেই লোকসাহিত্যের স্তর হইতে শিষ্টসাহিত্যের স্তরে আনয়নের চেষ্টা করিয়াছেন। বিশেষতঃ যেখানে মুকুন্দরাম নিজেই বলিতেছেন যে তিনি কাব্যরচনা ব্যাপারে মানিকদত্তের নিকট ঋণী। ডঃ ভট্টাচার্য্য অবশ্য পরে যাহা বলিয়াছেন আমরা তাহার সহিত একমত এবং তাহা হইল এই যে - ''কবি মুকুন্দরামের নিকট ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগেও মানিকদত্তের নাম অপরিচিত না হইলেও তৎপরবর্ত্তী যুগেই তাঁহার প্রচার একমাত্র তাঁহার নিজের অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।'' আমরা মনে করি ইহাতো সত্য বটেই, ইহার উপরেও এই হওয়া সম্ভব যে মানিকদত্তের এই সঙ্কুচিত ক্ষেত্রের উপরেও কবিকঙ্কনের প্রভাব আসিয়া পড়িয়া মানিকদত্তের রচনাকেও --

স্থলবিশেষে অধিকার করিয়াছে, কিন্তু সমভাবেই আমরা বিশ্বাস করি যে - স্থলবিশেষে বিশেষত: পাণ্ডিত্য পরিচয়হীন অংশগুলিতে মুকুন্দরামও কিছু কিছু মানিকদত্ত হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন অথবা জনসমাজে এককালে মুখে মুখে প্রচলিত মানিকদত্তের অনেক পংক্তি মুকুন্দরামের কাব্যেও আসিয়া পড়িয়াছে।

দুই মানিকদত্তের প্রশ্ন এখন বিবেচ্য :- ডঃ ভট্টাচার্য্যের উক্তি অনুসারে মনে হয় মুকুন্দরামের পূর্ব্বে এক মানিকদত্ত ছিলেন এবং মুকুন্দরামের পরেও নামহীন কোন কবি মানিকদত্তের জীর্ণ উপাদান এবং মুকুন্দরামের কাব্য মিলাইয়া মিশাইয়া মানিকদত্তের নামে বর্ত্তমানে প্রচলিত চণ্ডীমঙ্গলটি রচনা করিয়াছিলেন এবং এই অজ্ঞাতনামা কবিকেই ইদানীংকালে নাম দেওয়া হইতেছে মানিকদত্ত বলিয়া। মানিকদত্তের কোন কোন পুঁথিতে একটি পদের উল্লেখের কথা পাওয়া যাইতেছে। যেমন :-

প্রথমত: - '' আপনি মানিকদত্ত মানিকদত্ত হৈল। ''

দ্বিতীয়ত: - '' মানিকদত্ত রচিয়া মানিকদত্ত কৈল।। ''

ডঃ ভট্টাচার্য্য দ্বিকবি বোধক এই পংক্তিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়াছেন এবং ই ইহার মধ্যে গায়নদিগের যথেচ্ছাচারিতার ইঙ্গিত দেখিয়াছেন। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁহার আলোচনার মধ্যে দুই মানিকদত্তকে স্বীকৃতি দিতে পারেন নাই x এবং বলিয়াছেন - '' কালক্রমে লোকমুখে এবং গায়নদের প্রক্ষেপের ফলে মানিকদত্তের মূলপুঁথির খোলনলিচার অনেকটাই বদলাইয়া গিয়াছে। '' অধ্যাপক ডঃ সেন মহাশয় দুই মানিকদত্তের কথাই বলিয়াছেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত পুঁথির ভিত্তিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর এক অর্বাচীন মানিকদত্তের কথা বলিয়াছেন। তাঁহার যুক্তির ভিত্তি এই লাইন দুইটি :- '' অভয়া প্রসন্নে মানিকদত্তে গায়।
রচিল মানিকদত্ত ভবানী সহায়।। ''

এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথির বহুস্থানে চৈতন্য ও তৎসম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। '' কিন্তু এই ভিত্তিটি যে যথেষ্ট নয় তাহা আমরা পূর্ব্বে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। এই বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে মানিকদত্তই অভয়া প্রসন্নে গীত গাহিয়াছেন এবং সেই মানিকদত্তই ভবানীর অনুগ্রহে কাব্যটি রচনা করিয়াছেন। আমরা যে পুঁথি পাইয়াছি তাহাতে ডঃ ভট্টাচার্য্য এবং ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্ধৃতির কোন অংশই নাই। সুতরাং আমাদের পুঁথির ভিত্তিতে আমরা বলিতে পারি যে ঐগুলি পরবর্ত্তীকালের প্রক্ষেপ। ডঃ ভট্টাচার্য্য এবং ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়েই কেহ পরোক্ষভাবে এবং কেহ প্রত্যক্ষভাবে ইহাকে প্রক্ষেপই বলিয়াছেন। ডঃ সেন মহাশয়ের উদ্ধৃতি আমাদের প্রাপ্তপুঁথিতে ঠিক ঐভাবে নাই, তবে উহার কাছাকাছি নিম্নরূপে আছে। যেমন -

(১) অভয়া প্রসন্নে গীত মানিকদত্তে গায়।
নায়েকের কল্যান করিবে মহামায়।। পৃ. ৪৪।

(২) অভয়া প্রসন্নে গীত মানিকদত্তের রচনা।
নাএকের মনোনীত পূরাই কামনা।। পৃ. ৬৬।

(৩) অভয়াচরণে মজুক মোর মন।
কবি মানিকদত্তে গান মধুর বচন ।। পৃ. ১১ ।

(৪) অভয়াপ্রসন্নে গীত মানিকদত্তে গায়।
চণ্ডপ্রচণ্ড দেবী হৈবে বরদায় ।। পৃ. ১৪০ ।

(৫) রচিল মানিকদত্ত ভবানীর বর । পৃ. ২১৫ ।

এই সমস্ত উদ্ধৃতি এবং অনুরূপ আরও অনেক ভণিতা আলোচনা করিলে ইহাই বরং প্রকট হইয়া উঠে যে যিনি গায়ক তিনিই মূলতঃ রচনাকারী । অধিকন্তু কাব্যসৃষ্টির যে কাহিনী তাহাতে দুই মানিকদত্তের প্রশ্ন আনয়ন করা, xxxxx আমাদের মনে হয়, চলেনা ! তাছাড়া যে সকল পংক্তির ভিত্তিতে দুই মানিকদত্তের কল্পনা করা হয় তাহার ব্যাখ্যা এক মানিকদত্তের পক্ষেও লওয়া চলে এবং উভয়পক্ষেই যুক্তির মূল্য হয়তো সমান সমানও হইতে পারে কিন্তু একজনের পক্ষে যে যুক্তি বিশেষতঃ আমাদের পুঁথিতে উল্লিখিত ভণিতার ভিত্তিতে যে যুক্তি তাহা একের পক্ষেই যায় । দুই এর পক্ষে নেওয়া যুক্তি তখনই প্রবলতর হইতে পারে যখন এমন কোন পুঁথি পাওয়া যায় যাহার সহিত বর্তমান পুঁথির তুলনা করিয়া xxxxx একজনের প্রাচীনতা ও একজনের অর্বাচীনতা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে । তৎপূর্বে দুই মানিকদত্তের প্রশ্নে স্বীকৃতি দেওয়ার মধ্যে যুক্তির দুর্বলতা থাকিয়া যায় । প্রসঙ্গত এইক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত(১৩৪৫) তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মতের সঙ্গে আমাদের মতের মিল রহিয়াছে । এই প্রসঙ্গে তাঁহার বক্তব্য এই :- ''বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালায় সম্প্রতি মানিকদত্তকৃত একখানি চণ্ডীমঙ্গলের খণ্ডিত পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে । ইহার মধ্যে এমন একটি অংশ পাওয়া যাইতেছে, যাহা দেখিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক যে আলোচ্য মানিকদত্তের প্রতিই মুকুন্দরাম বিনয় প্রকাশ করিয়া থাকিবেন । এমনকি হয়তোবা মানিকদত্ত রচিত চণ্ডীমঙ্গল দেখিয়া ও পাঠ করিয়াই মুকুন্দরাম তাঁহার বিখ্যাত কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই বর্ণনাটি যথার্থ হইলে বলিতে হয় যে, মানিকদত্ত মুকুন্দের পূর্বে চণ্ডীর গান রচনা করেন এবং তাহা দেখিয়া মুকুন্দ স্বীয় গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্তিলাভ করেন বলিয়া মানিকদত্তের প্রতি তাঁহার বিনয় প্রকাশ স্বাভাবিক ।''

~~উপসংহারে বলি, আমাদের রচনার এই অংশে আমরা নানা পুরু- মত উল্লেখ করিয়া আলোচনা করিলাম । গভীরতর ও ব্যাপকতর আলোচনায় যাওয়া আমাদের পক্ষে নানাকারণে সম্ভব নয়, সেইজন্যই একথা অকপটভাবে স্বীকার করিতেই হয় যে সুপণ্ডিত ব্যক্তিদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন আমাদের উদ্দেশ্য নয় । যে ঐতিহাসিক সত্য মানিকদত্ত xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ও তাঁহার কাব্যের পৃষ্ঠভূমিতে রহিয়াছে তাহার সন্ধান করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য । উপরন্তু আমাদের এই গভীর বিশ্বাসও রহিয়াছে যে-~~

~~''যাহা হৈতে গুরু বস্তু নাহি সুনিশ্চিত ।~~
~~তথাপি গুরুর ধর্ম গৌরব বর্জিত ।।''~~

|| পর পৃষ্ঠায় →

স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে[১] (পৃ. ৩৩৫), মানিকদত্তকে ত্রয়োদশ-শতাব্দীর শেষের লোক বলিয়াছেন। তাঁহার মতে মানিকদত্তের গ্রন্থের সৃষ্টিপত্তন অংশটি শূন্যপুরাণের ধারার মত কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন যে পৌরাণিক-চণ্ডীর মিশ্রণ মানিকদত্তের হাতে হয় নাই। আমরা কিন্তু আমাদের পুঁথি-গুলি পর্যালোচনা করিয়া তাহা বলিতে পারিনা বরং ইহাই বলা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় যে মানিকদত্ত প্রাচীনতর লোকসমাজে প্রচলিত কাহিনী অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ লিখিলেও তিনি নিজেই মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে বর্ণিত দেবীর সহিত মঙ্গলচণ্ডীর সমতা আনয়ন করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে চণ্ডীর আরাধনা সেন রাজত্বের কালেও অন্ততঃ স্ত্রীসমাজেও প্রচলিত ছিল, তাহা যে রূপেই থাকুক-না কেন।

বিশ্ববিখ্যাত ভাষাচার্য্য ও জাতীয় অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ডঃ শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে[২] (পৃ. ১৩১), মানিকদত্তকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ত্রান্তিককালে অর্থাৎ ১২০০ হইতে ১৩০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে স্থান দিয়াছেন। তাঁহার মতে বাঙ্গালীর ~~অন্যতম~~ কালকেতু-ফুল্লরা ও ধনপতি-খুল্লনা সম্বলিত অন্যতম জাতীয় কাহিনীও এই একশ বছরের মধ্যেই গড়িয়া ~~xxxxxxxxxx~~ উঠিতেছিল এবং পরবর্তী কয়েক শতাব্দীতে[৩] ঐ কাহিনী অবলম্বনে লিখিত কাব্যের উদ্ভব হইয়াছিল। এই মতের মধ্যে মানিকদত্ত সম্পর্কিত সত্য নিহিত আছে বলিয়া আমাদের ধারণা। পূর্ব্বের অনুচ্ছেদগুলি হইতেও ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিবে বলিয়া আশা করা যায়। প্রসঙ্গতঃ 'শেক-শুভোদয়া' গ্রন্থে[৪] উল্লিখিত পূর্ববঙ্গের রাজা বিক্রমকেশরীর আদেশে বণিকের দ্বাদশ বৎসরের জন্য বাণিজ্যে-যাত্রা এবং ফিরিয়া না আসায় স্ত্রীর [illegible]-কেতকাহিনীর উপাদানের সাথে তুলনার যোগ্য বলিয়া মনে হয়।

উপসংহারে বলি, আমাদের রচনার এই অংশে আমরা নানা গুরুমত উল্লেখ করিয়া আলোচনা করিলাম। গভীরতর ও ব্যাপকতর আলোচনায় যাওয়া আমাদের পক্ষে নানাকারণে সম্ভব নয়, সেইজন্যই এইকথা অকপটভাবে স্বীকার করিতেই হয় যে সুপণ্ডিত ব্যক্তিদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যে ঐতিহাসিক সত্য মানিকদত্ত ও তাঁহার কাব্যের পৃষ্ঠভূমিতে রহিয়াছে তাহার সন্ধান করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। উপরন্তু আমাদের এই গভীর বিশ্বাসও রহিয়াছে যে — "যাহা হৈতে গুরুবস্তু নাহি সুনিশ্চিত।
তথাপি গুরুর ধর্ম্ম গৌরব বর্জ্জিত ।।"

---

১. History of Bengali language & literature.

২. Origin and Development of the Bengali Language.

৩. "But the national legends of Bengal, the Stories of Gopi-canda, of Behula and Lakhindar, of Khullana and Dhanapati, of Phullara and Kala-Ketu and of Lau-sena which were treated in great poems in the following Centuries, were probably taking shape during this Century." - O.D.B.L.

৪. Sekasubhodaya of Halayudha-Misra - Chapter X. by Sukumar Sen 196

মানিকদত্ত ও কবিকঙ্কন

- - - - - - - - - - - -

মানিকদত্ত কাব্য আরম্ভ করিয়াছিলেন সৃষ্টিপত্তন দিয়া এবং এই সৃষ্টিপত্তন শূন্যপুরাণ ধর্ম্মমঙ্গলের সৃষ্টি কাহিনীর অনুগত। এই সৃষ্টির ধারায় তিনি আদ্যাদেবী ভবানীর সংক্ষেপ্ত দেখাইয়া হিমালয়গৃহে শিবের সহিত তাঁহার বিবাহ ঘটাইয়াছেন এবং তাহার পরে এই দেবীকে উদ্দেশ্য করিয়া গানের পালা আরম্ভ করিতেছেন। মুকুন্দরামে দেখি তিনি গণেশ, সরস্বতী, মহাদেব, লক্ষ্মী, রাম, চণ্ডী, শুকদেব, শ্রীচৈতন্য ও দিক্‌বন্দনা করিয়া আদিদেব ও আদিদেবীর কথা উত্থাপন করিয়াছেন এবং তাহার পরেই সৃষ্টিপ্রকরণ। এই সৃষ্টিপ্রকরণেও আদিদেব নিরঞ্জনের নামমাত্র উল্লেখ আছে বটে কিন্তু আসলে ইহা পুরাণ এবং সাংখ্যদর্শন প্রভাবিত কিন্তু এই জাতীয় প্রভাব মানিকদত্তের সৃষ্টিপত্তনের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়না। কবিকঙ্কনে দক্ষযজ্ঞের কাহিনীটি পূর্ণভাবেই বিধৃত কিন্তু মানিকদত্তে এই কাহিনী অনুপস্থিত। কবিকঙ্কনের হাতে হিমালয় কন্যা পঞ্চবরষের পরেই চণ্ডী আখ্যা পাইয়াছেন, এবং এই চণ্ডী আসলে গৌরী এবং মেনকার গর্ভজাত কন্যা কিন্তু মানিকদত্তে পাই গৌরী হিমালয়ের পালিতা কন্যা। হরিব্রাহ্মণের গৃহে একটি কন্যা জন্মিলে হরি বুঝিতে পারিলেন যে এই কন্যা দুর্গা, সে তাহাকে 'ভাণ্ডতে' আসিয়াছে, সেইজন্য তিনি তাহার লালন পালনের ব্যবস্থা না করিয়া 'হাণ্ডতে' রাখিয়া জলে ভাসাইয়া দিলেন। তৎপরে হিমালয় তাহাকে পাইয়া স্ত্রীর নিকট দিলেন। তখন -

> কন্যা পাঞা মেনকা নানা বুদ্ধি বাটে।
> আটকুর দাএ মুচাতে দন বান্ধে পেটে ॥
> দন পেটে বান্ধি রানি নগরে চলিল।
> লোকে বোলেন রানি গর্ভবতি হৈল ॥
> ঘরে আসিঞা রানি দন খুচাইল।
> উভাচুভা করি কন্যা কান্দিতে লাগিল ॥ পৃ • ৬

ইহা হইতে বোঝা যায় যে মানিকদত্তের কাহিনী এইরূপ অনেকস্থলেই সংস্কৃত পুরাণ বা কাব্যকাহিনীর একান্ত অনুগত না হইয়া লোকশ্রুতির আশ্রয় লইয়াছে। মনে হয় মানিকদত্ত এইরকম অন্যান্য বহুস্থলেই নবপুরাণ সৃষ্টির সাক্ষ্য রাখিয়া গিয়াছেন। অথবা বলা চলে তিনি লোকপ্রচলিত কাহিনীকেই আশ্রয় করিয়াছেন।

শিবগৌরীর বিবাহ প্রস্তাব অংশে নারদের ভূমিকা, মদনভস্ম, রতির খেদ, এবং রতির প্রতি দৈববানী প্রভৃতি উভয়কাব্যে একইরূপ হইলেও মুকুন্দরামে যে বর্ননা পারিপাট্য তথা সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব, মানিকদত্তে তাহা অনুপস্থিত। শিব পার্ব্বতীর বিবাহে নারীগণের পতিনিন্দা একটি অংশ মুকুন্দরামে আছে কিন্তু মানিকদত্তে তাহা নাই। দেবীর শরীরের ময়লা হইতে গণেশের জন্ম উভয় কাব্যেই একরূপ, তাহার গজমুণ্ডের কারণও একইরূপ।

কবিকঙ্কণ মেনকার সহিত গৌরীর কলহ, শঙ্করের ভিক্ষা, হরগৌরীর কলহ, গৌরীর খেদ অংশ বর্ণনা করিয়া 'পদ্মার উপদেশ' অংশে দুই-কাহিনীব্যাপী তাহার কাব্যের পরিকল্পনা পাঠককে জানাইয়া দিয়াছেন। মানিকদত্তে এইগুলি পাইনা, পরে যাহা পাই তাহাতে মানিকদত্তের ঘটস্থাপন করিয়া গান আরম্ভের প্রার্থনাটি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে দেখি। এই প্রার্থনায় শুধু দেবী মঙ্গলচণ্ডীই রহিয়াছেন অন্য কোন দেবদেবী নাই। ইহার পরে যাহা আছে তাহা হইল অসুরের জন্ম, বিষ্ণুর যুদ্ধ এবং দেবীর সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়া কালী মূর্তি ধারণান্তে সমস্ত অসুরদের নিধন। এই কালীমূর্তির ব্যাখ্যা মানিকদত্ত খুব সম্ভব লোকপ্রচলিত ব্যাখ্যাই দিয়াছেন। যেমন -

> ভদ্রকালীর রণ দেখি দেবগণ ভাবে।
> ব্রহ্মা বলে এতদিনে সৃষ্টি নাশ হবে।।
> সৃষ্টিরক্ষার তরে শিব রণেতে আইল।
> উলঙ্গ হইয়া শিব রণেতে শুইল।।
> হুহুঙ্কার ছাড়ি ক্রোধে দিঞা করতালি।
> অসুর বুলিঞা শিবের বুকে চড়িলেন কালী।।
> পদতলে শিবকে দেখি লজ্জা বড় পাল্য।
> দন্তে জিহ্বা ধরি কালী ক্রোধ নিবারিল।। পৃ.-২৭

এই দেবী কোন সময়ে ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন যে পদ্মার পূজা প্রচারিত আছে অথচ তাঁহার পূজা নাই ইহার কারণ তিনি ~~তিনি~~ পদ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে পদ্মা তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে ধূম্রাসুরের ভয়ে কেহ দেবপূজা করিতে পারেনা তবে পদ্মা নিজের পূজার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিলেন ধূম্রাসুরের সেবা করিয়া। মানিকদত্তের গ্রন্থ অনুসারে মনে হয় চণ্ডীমঙ্গলের বীজ এইখানেই নিহিত এবং চণ্ডীপূজা প্রচলিত হওয়ার পূর্বেই মনসার পূজা এদেশে প্রচলিত ছিল এই ঐতিহাসিক ইঙ্গিতটি মানিকদত্তের গ্রন্থেই মিলিতেছে কিন্তু কবিকঙ্কনে বিষয়টি ঠিক এইভাবে উল্লিখিত হয়নাই। সেখানে দেখি, গৌরী দরিদ্র সংসারের অশান্তিতে অত্যন্ত অবসন্ন হইয়াই তার ভাগ্যে এমনটা কেন হইল এই প্রশ্ন করিতেছেন পদ্মার কাছে। পদ্মা তাঁহাকে ভবিষ্যৎ ইতিহাস কথা সংক্ষেপে বলিয়া তাহাকে মর্তে পূজা প্রচারের চেষ্টা লইতে বলেন। মানিকদত্ত মর্তে পূজা-প্রচারের শত্রু ধূম্রাসুরের সহিত দেবীর যুদ্ধ ঘটাইয়াছেন এবং সেই অসুরকে নিহত করাইয়াছেন। তাহার পরে পদ্মার উপদেশ কলিঙ্গে দেহরা নির্মাণ ও কলিঙ্গরাজ কর্তৃক দেবীপূজা। মানিকদত্তের চণ্ডী ইহার পরেই চিন্তিত পীতপুঁথির মাধ্যমে কি করিয়া জনসমাজে তাঁহার মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়, এবং এই চিন্তার (ও) পদ্মার উপদেশে দেবী মানিকদত্তকে আশ্রয় করেন তাঁহার মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য। এইখানে আবার মানিকদত্তের নবপুরাণ সৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায়। তাহা হইল এই যে তিনি দেবীকে পুঁথির সন্ধানে -

লাগাইয়াছেন এবং দেবী ইন্দ্রপুরী হইতে সেই পুঁথির এক অষ্টমাংশ মাত্র লইয়া আসিয়া মানিকদত্তের শিয়রে রাখিয়া স্বপ্নে জানাইয়া যান যে মানিকদত্ত যেন এই গ্রন্থের মাধ্যমে মাহাত্ম্য প্রচার চালাইয়া দেবীকে মর্ত্তে বিখ্যাত করিয়া তোলে।

মানিকদত্ত যদিও নিজে কানাখোঁড়া ছিলেন এবং দেবীর বরে তাহার কানাখোঁড়া ভাবও কাটিয়া গিয়াছিল তথাপি পুঁথিটি এত দীর্ঘ যে মানিকদত্ত একমাস পড়িয়াও তাহার কূলকিনারা করিতে পারেন নাই এবং সেইজন্যই বোধহয় কতকটা বিরক্ত হইয়াই তিনি পুঁথি বাঁধিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন। দেবী তাহা জানিতে পারিয়া পুনরায় স্বপ্নে বলিয়া যান কোনরূপ সংশয় না করিয়া তাহা প্রচার করার কথা। মুকুন্দরামে আছে স্বপ্নে গান রচনার আদেশপ্রাপ্তির কথা। পুঁথি রচনার পরে মানিকদত্তের গান প্রচারে কলিঙ্গযাত্রা, কলিঙ্গরাজ কর্ত্তৃক বন্ধন, দেবীর প্রভাবে মুক্তি এবং কলিঙ্গের দেহরায় সম্প্রদায় সহিতে গান সমাপন। ইহার পরে মানিকদত্তে আছে সুরথরাজার অনুরোধে দেবীর দশভুজ এবং ত্রিনয়নের ব্যাখ্যা প্রদান, কবিকঙ্কনে ইহা পাইনা। মানিকদত্তে আছে দেবীর নানা পশু-সৃজনের এবং শিবের বীজুবন সৃজনের কাহিনী। কবিকঙ্কনে পাই মাত্র এইটুকু :-

বিজুবন নিকটে ছিল যত পশুগণ।
পথে যাইতে চণ্ডীর পাইল দরশন।।

ইন্দ্রের তপস্যা ও ইন্দ্রকে ছলনা করিয়া দেবী কর্ত্তৃক পুত্রবরদানের কাহিনী মুকুন্দরামে নাই কিন্তু মানিকদত্তে আছে। মানিকদত্তে আরও রহিয়াছে নীলাম্বরের জন্ম, নীলাম্বরের বিবাহ এবং বিবাহ বাসরে কোন্দল যাহা মুকুন্দরামে নাই। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য যে ধর্ম্মকেতু ও নিশানকেতু যথাক্রমে কালকেতু ও ফুল্লরার পিতার তথা তাহাদের স্ত্রীদ্বয় যথাক্রমে নিদয়া ও কমলার জন্মকথা মুকুন্দরামে নাই কিন্তু মানিকদত্তে আছে। নিদয়ার সাধভক্ষণ অংশটি মানিকদত্তে নাই কিন্তু কবিকঙ্কনে আছে। মানিকদত্তে পাই দুই ব্যাধ অর্থাৎ ধর্ম্মকেতু ও নিশানকেতু শিকারে যাইয়া দেবীর চক্রান্তে উভয়ে উভয়কে পশু ভাবিয়া বাণ নিক্ষেপ করে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয় ও উভয়ের দুই স্ত্রীও তাহাদের সহমরণে যায়। একদিনে চারমরার শোক ফুল্লরা ও কালকেতু পায়। কিন্তু কবিকঙ্কনে এই ঘটনা নাই; সেখানে দেখি ধর্ম্মকেতু স্ত্রী সহ বারাণসীতে চলিয়া যায়। কালকেতু ও ফুল্লরার বিবাহাদির ব্যাপারে যে চিত্র কবিকঙ্কন অঙ্কন করিয়াছেন তাহা তাহার কাব্যের অন্যান্য বহু অংশের মতই ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কিন্তু মানিকদত্তে ইহার মধ্যে লোকজীবনের বাস্তবচিত্র আছে বলিয়া মনে হয়।

কালকেতুর বনে যাইয়া পশুশিকারের দৃশ্য একটি ছোট করুণকাহিনী মানিকদত্তে রহিয়াছে, কবিকঙ্কনে এই ছোট কাহিনীটুকু নাই।

উভয়গ্রন্থেই বনের পশুর উপর কালকেতুর উপদ্রব অসহনীয়। ইহার পর কবিকঙ্কনে পাই পশুগণের সিংহের নিকট আবেদন, সিংহের সমরসজ্জা, পশুগণের যুদ্ধ গমন এবং পশুগণের পরাজয় ও ক্রন্দন, মানিকদত্তে ইহার কিছুই নাই। দেবীর নিকট পশুদের প্রার্থনা উভয়গ্রন্থেই বিদ্যমান। মানিকদত্তে চার রকমের কাচুলী নির্মাণের বর্ণনা আছে। যথা - (১) দেব কাচুলী, (২) পুষ্প কাচুলী, (৩) মৎস্য কাচুলী ও (৪) পক্ষ কাচুলী। এই কাচুলীগুলির প্রতিটিরই বিশদ বর্ণনা আছে। মুকুন্দরামে কাচুলী নির্মাণ অংশে দশাবতার সমন্বিত বিষ্ণু এবং বৃন্দাবনের কৃষ্ণই আছেন। অন্যান্য বিবরণ খুব সংক্ষিপ্ত। কালকেতুর প্রতি ফুল্লরা অংশে উভয় কবির ভাব একরূপ, ভাষাও খুব কাছাকাছি তবে মানিকদত্তে রামকাহিনীর কিছুটা বিবৃত হইয়াছে যাহা মুকুন্দরামেও আছে বটে কিন্তু ভাবে ও ~~সাদৃশ্য~~ ভাষায় মিল নাই। দেবীর নিকট হইতে প্রাপ্ত কঙ্কন বিক্রয় করিয়া খন্তা-কোদাইল নেওয়ার জন্য প্রথমে চামাড়িয়ার কাছে এবং পরে বণিক পুরাই-দত্তের কাছে কালকেতুর যাওয়ার ঘটনা মানিকদত্তে আছে মুকুন্দরামে নাই। মুকুন্দরামে আছে অঙ্গুরীবিক্রয়ের জন্য মুরারি শীল নামক বণিকের নিকট যাওয়ার কথা। মুরারি শীল কালকেতুকে বঞ্চনা করার যে কৌশল প্রয়োগ করিয়াছিল মানিকদত্তের পুরাইদত্তের মধ্যে তাহা দেখিনা।

বন কাটিয়া গুজরাট নগর বসাইতে মুকুন্দরাম নানাধরণের গাছের নাম করিয়াছেন যাহা মানিকদত্তে নাই। মানিকদত্তে যেসব বিচিত্র গাছপালার নাম উল্লিখিত আছে তাহা আরও পূর্বের ঘটনা শিবকর্তৃক পশুগণের জন্য বীজুবন সৃষ্টির সময়ে। কালকেতুর অনুরোধে গুজরাট নগরপত্তনের সময় পদ্মার নির্দেশে দেবী কলিঙ্গের চারিমণ্ডলকে স্বপ্ন দেখান কলিঙ্গ ভাঙ্গিয়া গুজরাট নগরে আসিয়া বসবাস স্থাপন করিতে। চারিমণ্ডল এ বিষয়ে গোপনে যুক্তি করিয়া সিদ্ধান্ত লইলে ভাঁড়ু জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে শাসায় এবং তাহারাও নগর ভাঙ্গা হইতে বিরত থাকে। এই চারিমণ্ডলের কথা মুকুন্দরামে নাই, আছে শুধু বুলান মণ্ডলের কথা কিন্তু বুলানও দুর্গার স্বপ্নে কর্ণপাত করে নাই। ইহার পরে মানিকদত্তে আছে দেবীর ইন্দ্রালয় হইতে মেঘ সংগ্রহ করিয়া কলিঙ্গ ভাসানোর কথা এবং তাহার পর গঙ্গার নিকট বন্যা চাওয়ার কথা। এ ছাড়া গঙ্গাপুত্র ভাকডেউরের নিকট বন্যা চাওয়ার কথা মানিকদত্তে আছে কিন্তু মুকুন্দরামে এই অংশটুকু নাই। কলিঙ্গে বন্যার যে বিস্তৃত বিবরণ মানিকদত্ত দিয়াছেন তাহা অত্যন্ত বাস্তবানুগত এবং এই ধরণের বিবরণ আমরা কবিকঙ্কনে পাইনা। গুজরাট নগরের জাতিবিন্যাস অনেকটা উন্নত ধরণের মুকুন্দরামের কাব্যে। ভাঁড়ুদত্তের চরিত্রাঙ্কনে মানিকদত্ত অপেক্ষা মুকুন্দরাম অধিকতর কৃতকার্য। ভাঁড়ুদত্ত অপমানিত হইয়া গুজরাট হইতে ফিরিয়া আসার পর কলিঙ্গরাজ সেনার গুজরাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা পর্যন্ত কাহিনীঅংশ মানিকদত্তে অনুচিতভাবে সঙ্কুচিত কিন্তু

কবিকঙ্কনে বিশদভাবে বিবৃত। কালকেতুর যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে (নগর রক্ষার জন্য যাওয়ার পূর্বে) দেবীর পূজা করিয়া দেবীকে সন্তুষ্ট করিয়া 'হিড়িম্বকেশের চাল' পুরস্কার পায়। এই চালএর এমন গুণ যে যতক্ষণ সে ইহা ধারণ করিয়া থাকিবে দেবীর আশীর্বাদে ততক্ষণই তার জয় হইতে থাকিবে। কবিকঙ্কনে হিড়িম্বকেশের চাল প্রাপ্তির কোন ঘটনার উল্লেখ নাই। এই দিক হইতে কবিকঙ্কনের কল্পনা বরং বাস্তবানুগ কিন্তু এই বাস্তবতাও কবিকঙ্কন যুদ্ধক্ষেত্রে পুরোপুরি রক্ষা করিতে পারেন নাই যেখানে দেখি যোগিনীগণ আসিয়া মুণ্ডমালা গাথিয়া গলায় পড়িতেছে এবং দানারাও রাজার দলের বিরুদ্ধে হানা দিতেছে। মানিকদত্তের কাব্যে গুজরাট নগরের চতুর্দ্দারের যুদ্ধের বিবরণ রহিয়াছে কিন্তু কবিকঙ্কনে ইহা খুব সংক্ষিপ্ত, উভয়ক্ষেত্রেই অবশ্য দেবীর প্রভাব লক্ষ্যগোচর।

মানিকদত্তের কাব্যে কালকেতুর যুদ্ধজয়ের পর দেবী বিদায় লইতে চাহিলে কালকেতু স্বীকৃত হইল এবং ঠিক সেই সময়ে কলিঙ্গরাজ দেবীকে পূজার আয়োজন করিল। কালকেতুর ভাগ্যও এই সময়ে পরিবর্তনের মুখে আসিল। এই পূজাতেই সন্তুষ্ট হইয়া দেবী সুরথরাজাকে নির্দেশ দিলেন কেতুকে বন্দী করার জন্য কিন্তু দেবীর এই উক্তি রাজা শুনিলেননা, শুনিতে পাইলেন পুরোহিত এবং শেষে রাজসৈন্য সহযোগে ভাড়ুদত্ত গিয়া কৌশলে কালকেতুকে বন্দী করিয়া আনিল। কিন্তু কবিকঙ্কনে দেখি সুরথরাজার পূজার ফলে দেবীর এই ধরণের মন পাল্টানোর ঘটনা নাই। পরবর্তী ঘটনাগুলি প্রায় একরূপ। কলিঙ্গ কারাগার হইতে ছাড়া পাইয়া কালকেতু গুজরাটে ফিরিয়া আসিয়া ভাড়ুর শাস্তির ব্যবস্থা করে, তখন রাগে ভাড়ু তাহাকে আটকুড় বলিয়া গালি দিলে কালকেতু দুঃখিত হইয়া পুত্রলাভের আশায় গৃহবাস ছাড়িয়া গিয়া ফুল্লরা-সহিতে তপস্যা করিতে ইচ্ছা করে। এই সময়ে দুর্গা তাহাকে দেখা দিয়া তাহার পূর্বনিবাস স্বর্গস্থলের আভাস দেন এবং তাহাদিগকে পুত্রবর দান করিবেননা বলেন। ইহার পরেই দেবীর নির্দ্দেশে তাহারা অগ্নিকুণ্ড প্রাণ বিসর্জন দেয় এবং দেবী তাহাদের জীবাত্মা লইয়া পুনরায় পূর্বদেহে জীব সঞ্চার করিয়া ইন্দ্রের নিকট সমর্পন করেন। কিন্তু কবিকঙ্কনের কাহিনীতে দেখি কালকেতু উপযুক্ত পুত্র পুষ্পকেতুর হাতে রাজ্যভার দিয়া স্বর্গারোহন করে। পুষ্পকেতুর জন্মকথা সম্পর্কে অবশ্য মুকুন্দরাম কিছু বলেন নাই, এইদিক হইতে কালকেতু উপাখ্যানের শেষ অংশের ঘটনা মানিকদত্তের কাব্যেই উপযুক্ত হইয়াছে বলিতে হয়।

ধনপতি উপাখ্যানকে আশ্রয় করার কারণ মানিকদত্তের মধ্যে অষ্টমঙ্গলার শেষ চারদিনের গানের প্রয়োজন, কিন্তু কবিকঙ্কনের মতে স্ত্রীলোকের পূজা নেওয়ায় দেবীর ইচ্ছা।

মানিকদত্ত প্রথমেই কর্ণধারদিগকে স্বর্গভ্রষ্ট করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন মিথ্যার আশ্রয়ে, কিন্তু কবিকঙ্কনে ধনপতির স্বর্গভ্রষ্টতার কোন কথা নাই। মানিকদত্ত যদিও ধনপতিকে স্বর্গ হইতেই আনাইয়াছেন তথাপি পালাগানের শেষে তাহাকে মর্তেই রাখিয়া দ্বিতীয়া স্ত্রী, পুত্র ও দুই পুত্রবধূকে স্বর্গে লইয়া গিয়াছেন। ধনপতির জন্য সাংসারিক জীবনে বিচ্ছেদ বেদনার বোঝা বহন করা ছাড়া আর কিছুই আমরা মানিকদত্তর হাত হইতে পাইনা, xx এইখানেই মনে হয় ধনপতি মানিকদত্তের হাতে অন্যায়ভাবে উপেক্ষিত। সে তুলনায় কবিকঙ্কন ধনপতিকে সাধারন ধনবান বণিকরূপে চিহ্নিত করিয়া xxx ও পত্নী পুত্র, পুত্রবধূ বিচ্ছেদের কালে এইটুকু স্বস্তি রাখিয়াছেন যে তিনি সংসারে লহনাকে লইয়াই সুখী হইবেন এবং লহনার গর্ভে তাহাদের পুত্র জন্মিবে।

মানিকদত্ত লহনার সহিত ধনপতির বিবাহের বিবরণ দিয়াছেন এবং লহনার জন্ম ও প্রাক্‌বিবাহ জীবনেরও কিছুটা পরিচয় দান করিয়াছেন। কবিকঙ্কনে ইহা অনুপস্থিত। কবিকঙ্কন রত্নমালাকে শাপ দিয়া আনিয়াই খুল্লনা নামে জন্মাইয়াছেন এবং ধনপতির বিবাহের পর খুল্লনা লহনাকে সতিনীরূপে পাইয়াছেন। কিন্তু মানিকদত্তে ইহার পূর্ববর্তী কিছু ঘটনা পাই, দেবী নিজের কার্যসিদ্ধির জন্য ধনপতির দেশ উজানীর রাজা বিক্রমকেশরকে স্বপ্ন দেখান, তিনি যেন আটকুড়া ধনপতিxx সদাগরকে তাহার সভায় আসিতে না দেন। কার্যতঃও বিক্রমকেশর তাহাকে অপমান করিয়া রাজসভা হইতে xxx বাহির করিয়া দিয়াছিলেন তাহার ঐ আটকুড়া দোষের জন্য। অপমানিত ধনপতি লহনার কাছে গিয়া এ কথা বলায় লহনা তাহাকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে যে তাহার বয়স মাত্র এগার বৎসর, আরও চার বৎসর ধনপতি যেন পুত্রের আশায় অপেক্ষা করে তখনও যদি লহনার পুত্র সন্তান না হয় তবে ধনপতি যেন দ্বিতীয় বিবাহ করে, এইসঙ্গে লহনা একটি কুৎসিত ইঙ্গিতও করেন এই বলিয়া :-

পরার বালক প্রভু উদরে ধরিয়া।
ছেইলা দশবার প্রভু দিব প্রসবিয়া ।। পৃ- ১৬৬

ইহার ফলে অত্যন্ত ক্ষুব্ধচিত্ত লইয়া ধনপতি পায়রা উড়াইতে চলিয়া যান। এই অংশটুকু কবিকঙ্কনে পাইতেছিনা, কবিকঙ্কনে দেখি লহনা লোকমুখে স্বামীর দ্বিতীয়বার বিবাহের কথা শুনিয়া স্বামীকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিতে চেষ্টা করে :-

থাকে পুন্যাংশ   কোলে রহে বংশ
সুকৃতি সেই দম্পতি ।
যদি নহে তোক   শূন্য দুই লোক
দোঁহার কর্মের গতি ।।

মানিকদত্তের কাব্যে ধনপতির পায়রা খুল্লনার অঞ্চলে আবদ্ধ হইয়া যাহা করিয়াছে এবং খুল্লনাকে যাহা বলিয়াছে তাহা কতকটা শৃঙ্গার রসাভাসের অনুরূপ কিন্তু মুকুন্দরামে ইহা বেশ পরিমার্জিত। মানিকদত্তে ভাবী জামাতাকে দেখার জন্য আহ্বান পাইয়া রম্ভাবতীর প্রতিবেশিনীরা পতিনিন্দায় মাতিয়া উঠিয়াছে কিন্তু কবিকঙ্কনে ইহা নাই বরং তাহাদের ত্বরাজনিত সাজসজ্জার অপূর্ণতার কথাই তিনি বলিয়াছেন ইহা কাব্যের দিক হইতে উৎকর্ষের সূচক।

দেবীর পরিকল্পনান্তে ধনপতির খুল্লনাকে বিবাহান্তে রাজসভায় গমন এবং তৎপরবর্তী শুকশারী সম্বলিত ঘটনাবলী মানিকদত্তে সুশৃঙ্খল ভাবে বর্ণিত কিন্তু মুকুন্দরাম ইহাকে সংক্ষেপিত করিয়া খণ্ডশ: প্রকাশ করিয়াছেন এবং সেখানে দেবীর লীলাতেই যে এগুলি হইতেছে তাহা বোঝা যায়না। মানিকদত্তে লহনা ও খুল্লনার মধ্যে খুল্লনাকে লহনার ঈর্ষার বিবরণ স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়, দুবলা দাসীর কুমন্ত্রণার কোন স্থান এখানে দেখিনা বরং দুবলার অন্তরে খুল্লনার প্রতি একটু কোমলতাও বোধহয় ছিল। কিন্তু কবিকঙ্কন দেখাইয়াছেন যে খুল্লনার প্রতি লহনার ব্যবহার প্রথমে হৃদ্যই ছিল অন্তত: ধনপতি গৌড়ে যাওয়ার পরেই এবং দুবলার কুমন্ত্রণাতেই খুল্লনার ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে, এখানে মনে হয় কবিকঙ্কন কৃত্তিবাসের রামায়ণের মন্থরা চরিত্রের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। মানিকদত্ত যাহা স্বাভাবিক তাহাকেই রক্ষা করিয়াছেন ইহাতে লহনার চরিত্রটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মুকুন্দরামে খুল্লনার অনুরোধে দুবলা তাহার মাকে সংবাদ জানাইতে যাইতে চাহিতে রাজী হয় এবং লহনাকে সে এই বলিয়া যায় যে ঔষধ সংগ্রহের জন্য সে তিনচারিদিন অনুপস্থিত থাকিবে। মানিকদত্তে দুবলার এই চালাকিটুকু নাই। কবিকঙ্কনে রম্ভাবতী পুত্র 'ঘয়াই' কে খুল্লনার নিকট যাইতে বলিলেও সে দু:খ দেখিতে হইবে বলিয়া যায় নাই কিন্তু মানিকদত্তে এই গ্রন্থে রম্ভাবতীর পুত্র 'হরিবাণ্যা' বস্ত্র অলঙ্কার লইয়া ভগ্নীর সঙ্গে বনেই দেখা করে। ভগ্নী তখন লজ্জায় নিজের শরীর জঙ্গলের আড়ালে রাখিয়া ভাইএর নিকট হইতে বস্ত্রালঙ্কার গ্রহন করে এবং পরে বাড়ী গেলে লহনা এই বস্ত্র অলঙ্কার কুবচন বলিয়া খুল্লনার নিকট হইতে কাড়িয়া লয়। কিন্তু কবিকঙ্কনের দুবলা আসিয়া খুল্লনাকে জানায় :- শুনি আনন্দ না বলিল লক্ষপতি।

যৌপদে রহিল তব মাতা রম্ভাবতী ।।

ইহার পর কবিকঙ্কন শারীশুক, তরুলতা, ভ্রমর ও কোকিলের প্রতি খুল্লনার আবেদন জানাইয়াছে, মানিকদত্তে এই আবেদনগুলি নাই। মানিকদত্তে পাই অসহ্য দু:খের হাত হইতে অব্যাহতির জন্য খুল্লনা বনের ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সর্পাদিগকে তাহাকে ভক্ষনের জন্য অনুরোধ করিয়াছিল কিন্তু সে দুর্গার ব্রতদাসী বলিয়া তাহাকে কেহ স্পর্শ করে নাই।

কবিকঙ্কনে পাই রম্ভাবতীর বেশ ধরিয়া বনে চণ্ডীর খুল্লনাকে ছলনার কথা, মানিকদত্তে ইহা নাই। মানিকদত্তের চণ্ডী একবার ধনপতির বেশ ধরিয়া খুল্লনাকে স্বপ্ন দেখান এবং খুল্লনার বেশ ধরিয়া ধনপতিকে স্বপ্ন দেখান উভয়ের মিলনের আকুতি জ্ঞাপন করিয়া। কবিকঙ্কনে পাই খুল্লনা দেবীর প্রভাব ছাড়াই স্বপ্নে স্বামীর সহিত মিলিত হইয়াছিল আর চণ্ডী নিজে লহনা বেশে ও পদ্মা খুল্লনা বেশে সদাগরকে পাসাইয়া ছিল। ধনপতি পিঞ্জর লইয়া আসার পূর্বে কবিকঙ্কনে শারী শুককে উড়াইয়া দিয়াছেন কিন্তু মানিকদত্ত সেই পিঞ্জর স্পর্শ করাইয়া তবে উড়াইয়াছেন কারণ মানিকদত্তের কাব্যে পূর্বেই ইঙ্গিত ছিল সুবর্ণ পঞ্জর স্পর্শে পক্ষী দুয়ের শাপমুক্তি ঘটিবে। পিঞ্জর গঠনার্থে ধনপতির গৌড় যাত্রার কালে তথা সেইসূত্রে খুল্লনার বারমাস্যার বিবরণ উভয়কাব্যে এক নহে।

ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধের বাসরে সমাগত বণিককুলের মধ্যে বিবাদে কংসের জন্মকথা এবং সীতার চরিত্রে সন্দেহের কথা বেশ ব্যাপকভাবেই কবিকঙ্কন উল্লেখ করিয়াছেন। মানিকদত্তে হরিবংশ কথা নাই, রামায়ণের কথাও কয়েক লাইনে সমাপ্ত। খুল্লনার জৌঘর পরীক্ষার সময় মানিকদত্তে পাইতেছি খুল্লনাকে উদ্ধার করা লইয়া শিবদুর্গার কোন্দল এবং পরে উভয়ে ব্রহ্মার নিকট যাইয়া ব্রহ্মার সাহায্যে জৌঘর হইতে খুল্লনাকে রক্ষার ব্যবস্থা এ ছাড়া খুল্লনাকে জৌঘর পরীক্ষা দেওয়ানোর জন্য বিক্রমকেশর রাজার রোষ ও খুল্লনা মরিলে ধনপতির জ্ঞাতিগণকে রাজার শাস্তিবিধানের কথাও মানিকদত্তে আছে, এই উভয় ঘটনাই কবিকঙ্কনে অনুপস্থিত। ধনপতির সিংহল সফরে যাওয়ার প্রাক্কালে দেবী রাজভাণ্ডার হইতে চন্দন চুরির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং সেইসাথে রাজার বুকেও বিষবাণ মারিয়াছিলেন। সেই বিষবাণের যন্ত্রণা হইতে উদ্ধারের জন্য রাজভাণ্ডারে চন্দনের সন্ধান লওয়া হইলে জানা যায় ভাণ্ডারে চন্দন নাই এবং পরে সেই চন্দন সংগ্রহের জন্যই ধনপতিকে দক্ষিণ পাটনে রাজনির্দেশে যাইতে হয়, ইহা দেবীরই চক্রান্ত একথা বলাই বাহুল্য। কবিকঙ্কনে আছে পুরাণপাঠকের মুখে রাজা জানিতে পারেন যে জ্যৈষ্ঠ মাসে চন্দন দান, শিবমন্দিরে শঙ্খধ্বনি এবং হরিমন্দিরে চামর চুলানো অতিশয় পুণ্যের কাজ। রাজা তাই ভাণ্ডারীকে ডাকিয়া ভাণ্ডারের খবর লইয়া জানিলেন চন্দন, শঙ্খ প্রভৃতি অনেক দ্রব্যই রাজভাণ্ডারে নাই। বণিকেরাও আর এখন দূরে বাণিজ্যে যায়না, তখন রাজা বিক্রমকেশরী ধনপতিকে সিংহল পাটনে যাইতে বলেন।

ধনপতির সিংহল যাওয়ার সংবাদে লহনার যে উক্তি কবিকঙ্কনে পাই তেমন উক্তি মানিকদত্তে নাই, কবিকঙ্কনের লহনা বলিয়াছে :-

তোমার চরণে দুর্গা মাগি এই বর।
পুনরপি সাধু যেন না আইসে ঘর ।।

- - - - - - - - - - - - -

জিয়ন্ত পতিতে যার কিছু নাহি সুখ ।
সে জন মরিলে তার কিবা হয় দুখ ।।

মানিকদত্তের লহনাও পরোক্ষভাবে নিজগৃহ-সম্পদের হানি আশঙ্কায় কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছিল :-

প্রভু তথা গেলে পাইবা দুখ   দেখহ কামিনীর মুখ
সর্বস্ব রাজার ঘরে দিঞা ।
স্ত্রীর বচনে তুমি থাক ঘরেতে বসিঞা ।। পৃ. - 228

এই উক্তির সুযোগ লহনা পাইয়াছিল খুল্লনার উক্তি শুনিয়া যে উক্তির মধ্যে গৃহের চন্দন দিয়া রাজাকে সন্তুষ্ট করিয়া দক্ষিন পাটনে যাওয়া হইতে সাধুকে বিরত করার তাহার ইচ্ছা । কবিকঙ্কনের লহনা যে প্রার্থনা জানাইয়াছে তাহার উপযুক্ত ক্ষেত্র অর্থাৎ দুর্গার প্রতি ভক্তির ক্ষেত্র কবিকঙ্কন পূর্বে তৈরী করেন নাই তাই ইহা যেন অসঙ্গতিপূর্ন মনে হয় ।

ক্রুদ্ধ ধনপতির দেবীর ঘটে পদাঘাতের পরে মানিকদত্তের কাব্যে খুল্লনা দেবীর পূজার যে আয়োজন করিয়াছে তাহা একান্তভাবেই বৌদ্ধতন্ত্রপন্থী । এমন পূজার বিবরণ কবিকঙ্কনে নাই । যাত্রার উপযুক্ত সময় ছাড়িয়া যাওয়ায় তথা নানান্ অশুভ দর্শনে সন্দিগ্ধ চিত্তে ধনপতি দৈবজ্ঞ ডাকাইয়া আনে । গণক আসিয়া ভবিষ্যতে তাহার যাহা যাহা ঘটিবে তাহা বলিয়া দিলে ধনপতি ক্রুদ্ধ হইয়া গাভুরকে আদেশ দেয় দৈবজ্ঞকে গলাধাক্কা দিয়া দূর করিতে, এই ধরণের কোন ঘটনা কবিকঙ্কনে নাই ।

মানিকদত্তের গ্রন্থে ধনপতির মুখে কমলেকামিনীর কথা শুনিয়া রাজা শালবান রাজদরবারে বসিয়াই সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে ধনপতিকে বন্দী করেন কিন্তু কবিকঙ্কনে তিনি নৌকায় চড়িয়া সদলবলে কালিদহে গিয়াছিলেন । এবং উভয়গ্রন্থেই সাক্ষ্যগ্রহণ হইয়াছে বটে, কবিকঙ্কনে এইরূপ :-

সাধুর বচন শুনি বলে কর্ণধার ।
আমি নাহি দেখি হেথা কামিনী কুঞ্জর ।।

আর মানিক দত্তে পাই :- কান্ডার বলেন রাজা বলি সত্যবানী ।
চক্ষে নাই দেখি কমল শুন্যাছি জবানী ।। পৃ. - 23

কবিকঙ্কন শ্রীমন্তের বাল্যক্রীড়ায় বৎসহরণ ক্রীড়া, ব্রহ্মার বিস্ময়, প্রলম্ববধ ক্রীড়া প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণলীলার অনুকরণ দেখাইয়াছেন কিন্তু মানিকদত্তে তাহা নাই । শ্রীমন্তের পাঠ্যনির্বাচনে মানিকদত্ত উল্লেখ করিয়াছেন ক, খ, বারফলা, পিঙ্গল, সুবন্ত, অভিধান । কিন্তু কবিকঙ্কন এইস্থানে সংস্কৃত সাহিত্যের

বহু গ্রন্থের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কবিকঙ্কনে শ্রীমন্তকে পণ্ডিতের জারজ বলার ক্ষেত্রও আছে বিতর্কিত প্রশ্নের উত্তর লইয়া, মানিকদত্তে আছে চণ্ডীর কৌশলে হাতের খড়ি মাটিতে পড়িয়া যাওয়ার পর তাহা পণ্ডিতকে উঠাইতে বলিলে সেই ধৃষ্টতাজনিত শ্রীমন্তকে জারজ বলিয়া উক্তি। মানিকদত্ত ওঝাকে দিয়া খুল্লনাকে ভৎসনা করান নাই কিন্তু কবিকঙ্কন তাহা করাইয়াছেন।

বাণিজ্যব্যপদেশে ধনপতি ও শ্রীমন্ত দুইজনে দুইবার সিংহলে উপস্থিত হইলে কবিকঙ্কন রাজপুরোহিত অগ্নিশর্মাকে আনিয়া দুইবারই উপস্থিত করিয়াছেন কিন্তু মানিকদত্তে ইহা নাই।

মানিকদত্তে আছে ফিরিবার পথে তাহারা মগরায় আসিলে সুশীলার পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া দেবী ধনপতির ধনরত্ন যাহা মগরায় ডুবিয়াছিল তাহা তুলিয়া দিলেন। মুকুন্দরামে সুশীলার এই পূজার কথা নাই। আবার কবিকঙ্কনে বিত্রংমকেশরী রাজএর আলোচনা প্রসঙ্গে যে উত্তর মশানের কথা আছে তাহা মানিকদত্তে নাই। কবিকঙ্কনে ধনপতির হরগৌরী দর্শনের কথা বিস্তারিত ভাবে আছে যাহা মানিকদত্তে নাই কিন্তু দিশার মধ্যে ইহার সামান্য একটু ইঙ্গিত পাই মাত্র।

কবিকঙ্কনে কলির মাহাত্ম্য, কলির গুণ, হরিনামের মাহাত্ম্য আছে কিন্তু মানিকদত্তে ইহা নাই। চারজনের স্বর্গগমনের কালেও কবিকঙ্কনের চণ্ডী ধনপতিকে এই আশীর্বাদ দিয়া যান :-

লহনার গর্ভে হবে বংশের সঞ্চার।
তাহে লইয়া সুখে সাধু করহ সংসার।।

কিন্তু মানিকদত্তে ইহার উল্লেখ নাই। মানিকদত্তের হাতে স্বর্গভ্রষ্ট ধনপতির সান্ত্বনা কি? সে সম্পর্কে কবি নীরব। এদিক হইতে মুকুন্দরামের চিন্তাশক্তি নিখুঁত ও সুস্পষ্ট। ইহার পরে কবিকঙ্কনে হর-গৌরীর কথোপকথন রহিয়াছে কিন্তু মানিকদত্তে তাহা নাই আছে শুধু ব্রতকথা টুকু। ইহাতে একটি অংশ মুকুন্দরাম অপেক্ষা অতিরিক্ত আছে তাহা যখন দেবী চারিভক্তকে লইয়া স্বর্গে যাইতেছিলেন তখন তাঁহার যমের সহিত বিবাদ এবং পরে বিষ্ণু ও শিবের মাধ্যমে সে বিবাদ ভঞ্জন এবং দেবীর তাহাদিগকে লইয়া স্বর্গে গমন।

কবিকঙ্কনের ভাষা দুই কাহিনীতে দুইরূপ - কালকেতু খণ্ড সংস্কৃত ভাষা দ্বারা বেশী প্রভাবিত; ধনপতি উপাখ্যানে এই প্রভাব অনেক কম; উভয় অংশেই গৌড়িয় বৈষ্ণবতার ছায়া সুস্পষ্ট; মানিকদত্তের ভাষা উভয় অংশেই একরূপ - লোকানুগ; ইহা কোথাও বৈষ্ণবতাদ্বারা প্রভাবিত নয়। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে - ভক্তিভাব বৈষ্ণবতার নামান্তর নয়; ইহা তান্ত্রিকতার মধ্যেও সমভাবে বর্ত্তমান। কবিকঙ্কন খুব সম্ভব এই মানিকদত্তের দাঁড়াই[১]

---

১. "আদ্যকবি বন্দিলাম মহামুনি ব্যাস ‡ মানিক দত্তের দাণ্ডা করিয়ে প্রকাশ।" ৯.৩২ (পৃ.৪৬)

মোটামুটি অনুসরণ করিয়া নিজ বৈদগ্ধ্য ও রুচিদ্বারা মানিকদত্তের এই কাহিনীকেই সংস্কার করিয়া যুগরুচির অনুগত করিয়াছেন।
তাঁহার গ্রন্থপ্রচারের পর হইতে মানিকদত্তের প্রভাব দ্রুত কমিয়া আসিতে থাকে, শুধু তাহাই নয়, গায়নদের হাতে কবিকঙ্কণ মানিকদত্তের কাব্যেও কিছু প্রভাব বিস্তার করেন। কবিকঙ্কনের উৎকৃষ্ট অংশগুলি মানিকদত্তের নামে ইহারা চালাইয়াছিল। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ফুল্লরার বারমাস্যা ও নবদ্বীপ মাহাত্ম্য। অনুরূপভাবে ইহারও প্রমাণ রহিয়াছে যে কবিকঙ্কনের গায়নগণ ক্ষেত্রবিশেষে মানিকদত্তের রচনাকেও কবিকঙ্কনের পুঁথির স্থলবিশেষে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ কালকেতু কাহিনীর দেবীর শতনামকথন অংশের পাঠান্তর দ্রষ্টব্য (পৃ.সংখ্যা - ২৮২, কবিকঙ্কন চণ্ডী প্রথমভাগ, পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ ১৯৬২ ক.বি.)। ইহা হইতে আরও একটি কথা মনে হয় যে মানিকদত্তের এই গ্রন্থ প্রকাশনার পর পণ্ডিতবর্গের চেষ্টায়ই এখন পর্যন্ত প্রচলিত কবিকঙ্কনের নামে যে পাঠ তাহা পুনর্বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। কারণ ছাপাগ্রন্থের মূলেও গায়নদের হস্তক্ষেপ সম্বলিত হস্তলিখিত পুঁথিই ভিত্তিস্বরূপ।

সম-অঞ্চলের মনসামঙ্গল কাব্য রচয়িতা তন্ত্রবিভূতির -
কাব্যের সহিত সাদৃশ্য :- পদে, বাক্যে, বাক্যাংশে ও ভাবে।

(প্রথমে বর্ণানুক্রমিক ধারা ও সেইসঙ্গে পত্রের ক্রমানুযায়ী নিম্নে সাজানো হইল x বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ. শিলিগুড়ি শাখায় রক্ষিত তন্ত্রবিভূতির কাব্যের অনুলিপির অবলম্বনে। নিম্নে পুঁথির* পৃষ্ঠা সংখ্যা বামদিকে বন্ধনী চিহ্নে দেওয়া - রহিল)।

* পুঁথির সংখ্যা ২৫-৯০।

অ - অমর্ত্ত মর্ত্ত আর দ্রোণ যে পুষ্কর(১০৯।১), অত্রাই(১১০), আইঠা হাঁড়ি পাতিল মারে ফেলাইঞা (১২২।২)।
আ - আম্র নঞানে(১৬।১), আনল ভখিয়া (২৮১।১), আইহণ(২৯৪।২)।
উ - উথরা(৯৯।২), উজানীর হাট(১৮৪।১), উলুক(২৯৯।১)।
এ - এক নারিকলে নব দশ দশ শঙ্খ(১০২), এক যুবতি বোলে মা আমার কপালপোড়া (১৭৪।১)।
ও - ওহে প্রাণনাথ না যাইহ দূর দেশান্তরে(৮৩।১)।
ক - কাশিদগর কাড়া দামামা(৬২।১), কলিঙ্গনগরে(৮২।১), কাহ্নাইর নাটশাল(৯১।২), কড়িদহ(৯২), কোটাল(৯৪), কালিন্দ্রী জলে(১৯৫), কড়াটেকের(৩০২।২)।
খ - খিয়াতি (২৪।২)।
গ - গান্ধারী গারুলী (৭৯।১), গাবরগণ গীত গায় হৈঞা আনন্দিত(৯১।২), গৌর(দেশ)-(১০০।১), গাবর(১০১।১), গরথাই(১৯৩), গাড়া মহিষ(২৩৯।১), গাবরিয়াগণ বৈঠা বাহে(২৮০।২), গাভুর(২৯০।২)।
চ - চিঞাইতে(১৩), চক্রবাণ(২৬।১), চিতাও(২৯।২), চান্দর হাতে তাড়বালা(৮৩।২ চন্দ্রভাগা(১১০), চরণে উঝাট লাগে মাথে ঠেকে চাল(১২৭।১), চৌদল(২২৪)।
ছ - ছত্রিশবর্ণ(১৫।১), ছারুয়া (২৯১।১)।
জ - জাতিকুল করিবে বিনাশ (২৪৩।২)।
ঝ - ঝুনিকেথা (৬৪।২)।
ড - ডিঙ্গা বাহোরে ওরে কাণ্ডার সব (৯০।২)।
ঢ - ঢেকা মারিয়া(৪৯।১)।
ত - তোমার পিতার পুনো(৪৩।২), তাম্বুল ধর খাও(৫৪।১), তাহার বদলে নিব (৮১।১), ত্রিবেণী (৯১।১), তারাযু(১৩১।১), ত্রিভুবনে রাখিলে খাঁখার(২৭১।১)
দ - দোসাধ্য(৪৯।১), দেয়ানে(৬৩।২), দৈবজ্ঞকে বন্দী কর(৮০।১), দক্ষিণ পাটন(৮২ দুইস্তন নৈবিদ্য করে - জিভা কাটি অর্ঘ্য ধরে - কেশ কাটি চামর ঢুলায় — (১৮০।১)।
ধ - ধম্মতুল(১০২)।
ন - না যুয়ায়(১৪।১), নেতের(৪৬।২), নিধনিয়ার ঘর(২২৬), নাগের পেটারি(২৫৮। নৈল পাছু করিয়া (২৮৩।২)।
প - পঞ্চ বৎসরে কর্নবেদ করে(৩৭।২), পাইকে মারে মালশাট(৮৩।১), পুনর্ভবা (১১০), পাথালিয়া(২৫৫।২), পত্তয় না যায়(২৫৬।১)।
ব - বাসহর(১২।২), বসোয়া(১২।২), বোআলি মৎস্য(১৮।২), বুহিত(৪২।২), বিষফল খাঞা তুমি তেজিবা পরাণি(৯৭।১), বড়াড়ি রাগ(১২২।১), বিষাদ ভাবিঞা - কান্দে (১২৫।১), বাত্রে(১৩৮), বাঁধিল বিচিত্র খোপা আচড়িয়া কেশ(১৭৬।২ বোহারী (২৩৪।১),

ভ - ভ্রমরা , ভাগীরথী (৯১%১), ভুর(২৩৯) ।

ম - মজিন(৯১।১), মহানন্দা (১১০), মেড়ঘর(১১৯।২), মুকুতার হার গেঁথে মা আর - বেসর(২৫৯।১), মন্ত্রজোগ (২৭১।১) ।

র - রোহিলা = থাকিলা (১৩), র‍্যাহ, রাইহো (১৬৪।২), রাড়ী (২৩৪), রাইহোতি - (৩০৪।১) ।

ল - লাটা আর কুচাই (১৮৫।১) ।

*হ - হুর হুর শবদে মেঘ ইগার তোলায়(১০৯), হাঁড়ির মুখেতে জেন কুম্ভারে - গেঁথে মারা (১৫৮), হালিম নগরেতে(২৩৪।২), হাম্বকুড়ি(২৩৫) ।

শ - শ্রীকলার হাট(৪৪।১), শতদহ(৯২), শুতমাছি(১১৫।২), শুতনেত চাদর(২৭৭।১), শুতক্লাপ(১৮৯।১) ।

স - সেন্দুরিয়া (১০।২), সংহতি(৩৬।২), সাজিল অনেক ঠাট(৮৩।১), সনকার - রূপ ধরি - শিয়রেতে বিষহরি - সপনেতে দেয় আলিঙ্গন । (১০৩।২), সুপিনি পিঁথিনি ফিরে দিয়া ঘনপাকে(১২৭।১) ।

* - - - - - - - - - - - - - - - -

বিষয়-অঞ্চলের মনসামঙ্গল কাব্য রচয়িতা বিপ্রদাসের -
কাব্যের সহিত সাদৃশ্য:- পদে, বাক্যে, বাক্যাংশে ও ভাবে।

(প্রথমে বর্ণানুক্রমিক ধারা ও সেইসঙ্গে পত্রের ক্রমানুযায়ী নিম্নে সাজানো হইল, শ্রী সুকুমার সেন সম্পাদিত মনসাবিজয় কাব্যখানি অবলম্বনে। নিম্নে মনসাবিজয় কাব্যের পৃষ্ঠাসংখ্যা বামদিকে বন্ধনী চিহ্নে দেওয়া রহিল।)

অ - অমৃত কমণ্ডলু ধরি (৩০), অস্থিমালা ধরহ দ্বাদশ (৩৫)।

আ - আমার নিস্তার নাই(৩৭), আমলা তৈল দিয়া (৪২), আওয়ারি ঘর(৫২), আমি- হীন জাতি(৮২), আপন কিঙ্করে(৮৫), আপন চিনিয়া মন্দ না বলহ মোরে(১০৪ আঁবুয়া বাহিয়া গিয়া চাপাএ বুহিত(১৪২), আঠারো বাকড়া (১৮৫)।

ই - ইষ্টমিত্র যত দেখ সম্পদ সময়(৩৬), ইন্দ্রানী বাহিয়া নদীয়ায় উপনীত(১৪২)।

এ - একদৃষ্টে নেহালে (১৫), একেলা বামুনি বুড়ি(৭০), এ সুখ সম্পদ পাবি(৮৯), এড়ায়(১৪২), এক আইয় ভাবে মনে(১৯০)।

ঐ - ঐরি (১০২)।

ক - কামবাণ(১০), ক্ষিতি করে টলমল(২৩), কার্ত্তিক-গণাই(৩৬), করুনা করিয়া কান্দ- (৪৯), কোপানলে সুরপতি একদিষ্টে চায়, অলভঙ্গ দোষ ইন্দ্র শাপ দিল তায়।- (১৩৪), কর হানয়ে মাথায়(১৪০), ক, খ, গ, ঘ, ঙ পড়ে(১৫৩), কড়াকের (২০৬), কুচনির ঘরে(২১৮)।

খ - খেদাড়িয়া (৪৬), খরশান(৬৯), খড়্গ ভেদিয়া (১২১), খণ্ডব্রত কৈনু (২০৪)।

গ - গঙ্গারে আদেশ কৈল করিতে বন্ধন(৫), গজ মুকুতার ঝারা (৪১), গঙ্গের জলে (১০ গুপ্তিপাড়া (১৪২)।

চ - চোঙ্গদার(৬৯), চারিভিতে(৮৩)।

ছ - ছত্রিশ জাতি(১৯), ছত্রিশ আশ্রম(৮১)।

জ - জলসহে ঘরে ঘরে(৪১), জে ভিতে(৭৩), জিয়ে বা না জিয়ে(১২১) জাইব দেশেরে- মিতা দেহত বিদায়(১৫৫), জল তিল কুশ ... কন্যাদান করে শুভক্ষণে(১৯৫), জাইব প্রভুর সঙ্গে দেহত মেলানি(২০৭)।

ঝ - ঝুনা নারিকেল(১৪০)।

ট - টেঙ্গর (১৮৫)।

ঠ - ঠাট (৭০)।

ড - ডুবারু আনিয়া ডিঙ্গা তুলিলেক কুলে(১৩৯)।

ত - তার কথা তোরে কই(১৪), তার তরে(৭২), তব পিতৃপুণ্যে (৮৬) তারে নাথি- দশবিশ(১২৭), ত্রিবেণী (১৪২), তিক্ষ্ণ কাটারী (১৯২)।

দ - দেহত মেলানি(১২২), দৃঢ় কথা (১২৫), দৃঢ় করি মন(১২৯), দৃঢ় কৈল(১৩৮), দুহিত হৈলে নাম থুইও জয়মালা (১৪০), দাঁড়াইয়া নেহালে(১৭০), দাণ্ডায়(১৯২), দেশেরে(২০৭)।

ধ - ধরিল জোগান(২), ধর্ম্মের আজ্ঞায়(১২২), ধরিয়া দুহার হাতে মনসা তুলিল- রথে(২০২), ধর্ম্ম অবতার (২০৪)।

ন - নেতের পতকা (১৯), নখচির(২৯), নাহি লেখাজোখা তার(১৫৬), নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ- (১৮০), নাথী ঘায় (১৮৮)।

প - পেলায়, পেলিল(২৪), প্রমাদ পড়িল(৩১), পড়িলে আপদকালে কেহ কারো নয়(৩
পাইক([illegible]৩), পাটয়ার(৭১), পশ্চিমদিগে থানা(৭১), প্রথম জন্ম উজানিনগরে(১৩৬),
পাষাণ ভাঙিতে পারে দশনের ঘায়(২১৩)।
ফ - ফেলাইল(২৮), স্ফটিকের স্তম্ভ(৮৩)।
ব - ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল জেন শেলের প্রহারে(২৪), বাঙ্গালী খেলায়(২৪), বাঘছড়ি(৩৫)
বাদ্য বাজয়ে বিশাল(৮৫), বাতাবি, নারাঙ্গি(৯০), বাদ(১২১), বুহিত্র(১৪২),
ব্যাধগণ পক্ষফাঁদ(১৬১), বিভার বৈরাতি(১৮৫), বাকুড়া গুয়া(১৮৫),
ব্যাল্লিশ বাজনা(১৯৭), বলহ উঁচিদশ(২১৬)।
ম - মায়াপাতি(৪), মিনতি করিয়া(২৮), মহাজ্ঞান জপে মনে(৯১), মোঙ্গল-পাঠাণ-
(১৪৩), মেঘে অন্ধকার কৈল(১৫৬)।
য - যদি হারি দৃঢ় কহি সম্বিধান (৯৪)।
র - রায়বাঁশিয়া(৭০), রংপের মুরলি(১২০), রসইশালা(১৯৯), রসান কাটারী (১৯২)।
ল - ললাটের ঘর্ম হর ধারাই সৃজিয়া(১৮), লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল বদন মণ্ডলে(১৯৪)
লম্বকের বুহিতাল(২১০), লজ্জিয়া আমার ঘট বলে মন্দ বাণী(২১৯)।
* হ - হাব্যাসে(২২), হাসনের তরে(৮২), হুতাশে(১২১), হাঁচিজেঠি পড়ে যবে যাত্রা
করে রায় (১৪৩)।
শ - শান্তনু মুনি(৫), শ্রীরামলক্ষ্মণ ~~xxx~~ পথে(২), শব্দ হৈল বিপরীত(২৯),
শোভে শরতেক(৯২), শিবা-নদী(১৪২)।
স - সাজি(১৫), সর্বাঙ্গ বহিয়া ধারে পড়িছে রুধির(২৪), সবে পূজা নাহিক -
আমার(৫৭), সনে বেড়িল(৭১), স্ত্রী বধ ভাগে(১২৩), স্বপ্ন কহিবারে(১৩২),
সভা বিদ্যমান(১৪৩), সাহরাজ(১৭২), সুরঙ্গ রসাল গীত গায় নানা রসে -
(১৮৪), সেই নিরঞ্জন (২৩৪)।

* - - - - - - - - - - - -